সংখ্যা-১-২

অক্টোবর
ডিসেম্বর
১৯৮১

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চেতনা লহর

রণের হুঙ্কার এবং

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গল্প

ীতিক কালের কবি ও কবিতা

বিষয়ে নিবন্ধ

সাহিত্য সৈকত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বর্ষ ১ * সংখ্যা ১
আশ্বিন—পৌষ ১৩৮৮ / অক্টোবর—ডিসেম্বর ১৯৮১

সূচি

সম্পাদকীয়
কবিতা ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র * প্রেমেন্দ্র মিত্র * কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত * কৃষ্ণ ধর * সুজিৎকুমার রায় * রতন কুমার বসাক * ঈশানচন্দ্র মিশ্র * দীপক হোতা
গল্প ॥ প্রভাতকুমার গোস্বামী * মাধব ভট্টাচার্য * কাকলি ভট্টাচার্য
প্রবন্ধ ॥ হরপ্রসাদ মিত্র
পুস্তক পর্যালোচনা
প্রচ্ছদ ॥ রাজ সুশান্ত মিত্র

বছরে ৪ বার (যথাক্রমে অক্টোবর / জানুয়ারী / এপ্রিল ও জুলাই মাসে) নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে 'সাহিত্য সৈকত।'

প্রথম বছরের গ্রাহক চাঁদা ৫·০০ টাকা।
সাধারণ ডাকে ৬·০০ টাকা।

—ঃ তরুণ লেখকদের প্রতি ঃ—

'সাহিত্য সৈকত' পত্রিকার লেখক হতে চাইলে গ্রাহক হবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু ইতস্ততঃ লেখা পাঠিয়েও লাভ নেই। আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা জেনে নিন তারপর লেখা পাঠান।

সম্পাদকীয়

[সৈকত থেকে সাহিত্য সৈকত]

বাংলা সাহিত্য পত্র পত্রিকার জগতে আর এক নতুনের আবির্ভাব ঘটলো। নাম তার সাহিত্য সৈকত। সাহিত্য সৈকত-এর আবির্ভাব নতুন হলেও একেবারে আনকোরা নয়। ফেলে আসা দিনগুলোর মধ্যে তার জীবনের একটা স্মৃতি লুকিয়ে আছে—লুকিয়ে আছে একটা বেদনার ইতিহাস। —সে ইতিহাস একেবারে ছোট নয়, সামান্যও নয়।

১৩৭৮ সালের মহালয়ার দিনে 'সৈকত' নাম গায়ে মেখে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৮ থেকে ১৩৮৮ এই দীর্ঘ সময় সীমার মধ্যে নিয়মিত, অনিয়মিত 'সৈকত'-এর অনেক গুলো সংখ্যা বেরিয়েছে। এই এতদিনের বেঁচে থাকার জীবনে বেশীর ভাগটা জুড়েই রয়েছে যন্ত্রণা আর সহিষ্ণুতার এক অব্যক্ত ইতিহাস। ছোটো কাগজ সম্পর্কে যাঁদের এতটুকু ধারণা আছে তাঁরা এটা ভালো করেই জানেন। তার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

গত জুলাই মাসে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয় কিন্তু নামের পরিবর্তন ঘটে যায়।—'সৈকত' থেকে 'সাহিত্য সৈকত'। 'সাহিত্য সৈকত' 'সৈকত'-এরই নতুন নামকরণ। আপাততঃ তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হবে এবং নিয়মিত।

সাহিত্য সৃষ্টির পথে বিশেষ কোন ভাবধারার ঘোষক আমরা নই। যা কিছু সুন্দর তা-ই আমাদের গ্রহণীয়। মানুষের সকল সুন্দর এবং সার্থক সৃষ্টি কর্মের পেছনেই দীর্ঘ অনুশীলনের একটা অভ্যাস থাকে। আমরা তরুণদের মধ্যে সেই অনুশীলনের অভ্যাস গড়ে তুলতে চাই। এবং ট্রাডিশনকে ভেঙ্গে নয়, ট্রাডিশনকে আশ্রয় করে—ফেলে আসা দিনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে চাই বর্তমানের পথ ঠেলে ভবিষ্যতে দিকে—নতুনের দিকে।

১। ১০।৮১ **সম্পা।**

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দু'টি কবিতা

[৫৫নং সারপেনটাইন লেনে তখন আমার স্বামী থাকতেন
তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে, বঙ্গবাসী কলেজে পড়তেন। আমি
লাম আমার শ্বশুর বাড়ি ফরিদপুর জেলার সদরদী গ্রামে।
ঠিপত্রে নরেন্দ্রনাথ খুব নিয়মিত। বলা যায়, চিঠি ছিল তাঁর বড়
য় শুধু নয় একান্ত প্রাণের। মনের নানা ভাবনাকে তিনি চিঠিতে
মার কাছে ব্যক্ত করতে ভালোবাসতেন। সে চিঠিতে কখনও
নছক কথা দিয়ে ভরা থাকত না। আবার কথা ও কবিতায়
রা নরেন্দ্রনাথের কত চিঠি পেয়েছি। ১৯৩৮ সালের ২রা
ডিসেম্বর আমাকে লেখা সেই পুরণো চিঠি থেকে দু'টি কবিতা
সাহিত্য সৈকত'-কে দিলাম। **শোভনা মিত্র** ৫. ৯. ৮১.]

(১)

া কেন এতো তুমি তো নহ দীনা
মের সুরে বাঁধা তোমার হৃদি বীণা
রর ঝঙ্কার বাজিবে ভেবে মনে
লকে ওঠে তনু শিহরি ক্ষণে ক্ষণে।

ও কভু যদি তন্ত্রী যায় ছিড়ে
কি আজি ভেবে ভিজিবে আঁখি নীরে
থা ভেবে ভেবে গভীর বেদনায়
ও কি তব মনে শঙ্কা ছেয়ে যায়?

বল প্রিয়ে যদিই ছেড়ে তার
ছে ভাবিবার কী আছে বেদনার
রে মোরা বাঁধিব মনোবীণা
বীণা কভু রবে না সুরহীনা।

হাজার হাজার কথা মনে মোর কোরে আসে ভিড়
হাজার হাজার পাখী কোরে ওঠে কিচির মিচির
এলো মেলো সে রাগিনী কখনো কি কোনদিন কানে
কোন অর্থ, কোন সুর, কোন ছন্দ কিছু বয়ে আনে ?

নিশীথের অন্ধকারে এতোকাল নীরবে নিবিড়ে
যাহারা ঘুমায়ে ছিল বৃক্ষশাখে সুষুপ্তির নীড়ে
তোমার পায়ের শব্দে একসাথে উঠিয়াছে জেগে
রঙীন উষার আলো চোখে মুখে আসিতেছে লেগে।

আরক্ত আভাষ তারা দেখিয়াছে তোমার ও মুখে
হে উষসী তোমার বন্দনা তাই ধ্বনিছে পুলকে
তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে নানা সুরে কী বিচিত্র রাগে
যাহারা ঘুমায়ে ছিল এক সাথে আজি তারা জাগে।

উষার অরুণালোকে আনন্দের তুমি প্রতিচ্ছবি
তোমার বন্দনা গানে মুখরিত তাদের ভৈরবী
সুর নাই, ছন্দ নাই, নাহি অর্থ নাহি কোন ভাষা
তবু তা বুঝিবে নাকি বলো একি এতোই দুরাশা।

নদীরা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এই নদী এই প্রান্তর
এই অরণ্য-ভূমি, এই শস্য-শ্যামল দিগন্ত
এই সব নগর আর গ্রাম
একি শুধু মানচিত্রে আঁকা
আর ভূগোলের পাতায় লেখা
কিছু নাম আর বিবরণ ?
না, আমার হৃদয়ের
আর আমার সত্তা-ধারায়
এসব সময়ের জালে জড়ানো
ইতিহাস স্পন্দিত।

যুগযুগান্ত ধরে
এই মাটি জল আর আকাশ
আমার সত্তা প্রবাহের
উপাদান জুগিয়ে এসেছে
পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে।

একটা প্রদেশাংশের
কোণে এক ভূখণ্ড মাত্রের কথা বলছি না,
বলছি আমার এই দেশের
ইতিহাস বিবর্তিত
সেই প্রাণ প্রেরণার কথা,
যা আমাকে অখণ্ড ভারতের সঙ্গে
একাত্ম হয়েও
বাঙালী হয়ে ওঠার স্বাতন্ত্র-সাধনার
রহস্য-মন্ত্র শেখায়।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রলয়াগ্নির ধূমকেতু তুমি বিপ্লবী নজরুল
তবু গুল বনে গজল শোনাও বাগিচার বুলবুল।
বিদ্রোহী তুমি রুদ্রবীর্য অগ্নিবীণার করি
ইন্‌কুইলাব্ জিন্দাবাদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

বঙ্গবাণীর স্নেহের দুলাল ঘরে ঘরে পরিচয়
মৃত্যুর সনে কোলাকুলি কর বজ্রে মানো না ভয়।
বর্ধমানের বর্ধিত মান তব সুমহান্ দানে
উভয় বঙ্গ সুরতরঙ্গ তুলিলে তোমার গানে।

অগ্নিগর্ভ উচ্চার তব জ্বালাময়ী রসনার
রণচণ্ডীর নিশিত অসিতে ঝরায় রুধির ধার।
লেখনীও তব তীক্ষ্ণ শাণিত খঞ্জরে করে জয়
বিষের বাঁশীর বিষে জর্জর প্রাণ রয় কি না রয়।

চিত্তে তোমার চিন্ময়ী মা'র পুণ্য পীঠস্থান
সরূপে অপরূপ রূপ তাহারি গাহিলে গান।
খোদা তায়লায় পিতা ও মাতায় করিয়াছো রূপায়িত
কালোর চরণে আলোর নাচনে রূপ নিল রূপাতীত।

এক সৃষ্টির এক স্রষ্টারে করিয়াছো সন্ধান
একপ্রাণ তুমি করিতে চেয়েছো হিন্দু-মুসলমান।
এই জনপদে জনপদধূলি মাথায় ধরিলে ভাই
দেশের দশের হৃদয়-দেশের গভীরে তোমার ঠাঁই।

সঙ্কটকালে হে চারণ কবি! তুলিয়াছো হুঙ্কার
দুর্গমগিরি কান্তার চারী যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
প্রশ্ন করেছো,—তারা কি হিন্দু না তারা মুসলমান?

নও জোয়ানেরে নওজান দিলে যুগসন্ধির নবী
কৌমী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হিম্মৎদাতা কবি।
সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্রে যুগল শিবশক্তির স্থান
নরে নারায়ণে এক জানি মনে গাহো সাম্যের গান।

লভিলে 'রবি'র স্নেহসম্ভার 'বসন্ত' উপহার
লহ এ কবির প্রীতি সুগভীর অর্ঘ্য এ কবিতার।
এই বাংলায় রয় কবিপ্রিয়া ওই বাংলায় কবি
দুই বাংলায় যেন সে দেখায় রাখীবন্ধন ছবি।

তুমি এনেছিলে গানের বন্যা প্রাণের বন্যা সহ
তুমি রেখে গেলে আঁধার বিষাদ বিরহ দুর্বিষহ।
মৃত্যুঞ্জয়ী বীর! মৃত্যুরে তুমি নত কর নাই, তব উন্নত শির
তোমারে হেরিয়া নতশির হ'ল শিখর হিমাদ্রির।

স্মৃতির স্বর্গে সমাসীন তুমি কীর্তির ধ্বজা ধরি
ভারত ভারতী রোরুদ্যমানা তোমারে স্মরণ করি।

ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামীর বই

দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক	২০ টাকা
উনিশ শতকের দর্পণ নাটক	১৬ ,,
নোয়ার নৌকো	১০ ,,
বাংলা নাটকে গান	২০ ,,
ভারতীয় সঙ্গীতের কথা	১৬ ,,
মুক্তিযুদ্ধে নবেম্বর বিপ্লবের প্রভাব	১০ ,,

ডঃ উৎপলা গোস্বামীর বই

ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১২ টাকা
বাংলা গানের বিবর্তন	২০ ,,
ভজন মালিকা	১৬ ,,

ঃ পরিবেশক ঃ

নাথব্রাদার্স / ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

কলিকাতা।

সময়ের দীর্ঘরাত্রি

কৃষ্ণ ধর

তারপর সব কোলাহল থেমে যায় হঠাৎ
আলো নেভে
মুঠো মুঠো করে অন্ধকার ছুঁড়ে দেয়
তার নিষ্ফল হতাশা
সেই অদৃশ্য অতলে মিশে যায় সব
পরিচিত মুখগুলি মনে হয় অজ্ঞাত বিস্ময়।

তারপর সবাই বিষণ্ণ নদীর কিনারে
গিয়ে বসে
অপেক্ষা করে করে শেষ হবে সময়ের দীর্ঘরাত্রি।
ওরা হঠাৎ ঢেউয়ের শব্দ শুনে উচ্চকিত হয়
অন্ধকারের ভিতর শোনা যায়
কারা যেন দাঁড় ঠেলে চলে উজানে বেয়ে চলেছে
সময়ের দীর্ঘরাত্রি শেষ হবার আশায়।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বিষয়ে

হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতা আকাশ বা পাহাড় বা সমুদ্রের মতন শাশ্বত আবেদনেরও সামগ্রী, আবার, সময়ের মর্জি অনুসারে কবিতার আবেদনে জোয়ার-ভাঁটাও ঘটতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। তার মানে একাধিক জাতের বা স্তরের অনুভূতির ফলে কবিতার শ্রেণীগত বৈচিত্র্য ঘটা খুবই সম্ভব। না,—গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, নাট্যকাব্য, মহাকাব্য প্রভৃতি শ্রেণীর কথা বলছি না। 'আধুনিক' বা 'সাম্প্রতিক' বাংলা কবিতা বললেই কি একালের বাংলা-কবিতার সব বৈচিত্র্যের নির্যাস সূচিত করা যায়? অথচ অনেকেই ভাবতে চান এখনকার বাংলা কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে। ভাবতে চান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আদৌ কবিতা হচ্ছে কি না—এবং যেসব ক্ষেত্রে কবিতার গুণ তাতে বর্তেছে, সেসব ক্ষেত্রের বিশেষত্ব কতকটা সংক্ষেপে বলা যায় কিনা।

'সাম্প্রতিক' বা 'আধুনিক' দুটিই এখানে সমার্থক ধরে নিলেও ভাবতে হয়—এই সময়-সীমা ঠিক কোথায় শুরু হয়ে কোথায় শেষ হয়েছে। শেষের কথাটা না হয় উহ্য থাক্, কিন্তু সূচনার সময়টা তো ধর্তব্য বটেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমরা ভুলিনি, ভুলতে পারিনা। তবুও 'সাম্প্রতিক' বাংলা কবিতা তো আছেই। সেই সব রচনায় কিছু কিছু স্মরণীয় আবেদনের সঙ্গে অনেক ব্যর্থতাও মিশেছে।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধান (১৯৪১) থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের তিরোধান (১৯৬০) পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর—মানে, পুরো দুটি দশকের মধ্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ (তিরোধান ১৯৫৪), বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্বখ্যাত কবিদের রচনা চলছিল বটে, কিন্তু তারই মধ্যে অনেক নতুন কবি

আসরে এসেছেন যাঁদের কারো-কারো রচনার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না। ইতিমধ্যে সময় আরো বদ্‌লে গেল। পত্রিকার আসরও ক্রমেই সংকুচিত হোলো। ক্রমে দেখা দিল বহু সংখ্যক স্বল্পায়ু 'ছোটো-পত্রিকা'—এবং বেশ কয়েক বছর ক্রোধ আর কাম, এই দুটি রিপু আমাদের কবি-সমাজে কতকটা জাঁক দেখাবার চেষ্টাও করে গেল। কিন্তু সে তো কেবল কবিতার পারিপার্শ্বিক খবর। সেই খবরকে সৃষ্টির সফলতা বলে ধার্য করা চলেনা।

সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (২৫ জুন. ১৯৬০) পরেই বাংলা ১৩৬৭ সালের আষাঢ়ে 'এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি' থেকে কবি দিনেশ দাসের সম্পাদনায় 'পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবি' নামে একটি কবিতা-সংকলন বেরোয় যাতে ১৯১৭-র জাতক সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত থেকে শুরু ক'রে ১৯৪২-এর জাতক রমাপ্রসাদ দে পর্যন্ত পঁচিশ জনের প্রত্যেকেরই বেশ কয়েকটি করে কবিতা ছিল। তখনি বোঝা গিয়েছিল যে 'সাম্প্রতিক' কথাটি কতো বিভ্রান্তিজনক। সে-সময়ের অনেক সাম্প্রতিক কবিই বাদ গিয়েছিলেন সেই বই থেকে। সম্পাদক নিজেই তাঁর ভূমিকায় সে কথা স্বীকার করে লেখেন—"বর্তমান কবিদের ভিতর থেকে আমার পরিচিত মাত্র পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবির কয়েকটি কবিতা নিয়ে এই কাব্য-সংকলন। বিজ্ঞপ্তির অভাব ও অর্থনৈতিক কারণ না থাকলে হয়তো আরও পঁচিশজন কবি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। এই সংকলনের প্রস্তুতিকালে অথবা সমাপ্তির সময় কয়েকজন খ্যাতিমান তরুণ কবি এই কাব্য-সংকলনের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম ও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিদের বয়ঃক্রমের ধারাবাহিকতায় বিশৃঙ্খলা ঘটবে বলে তাঁদের এই সংস্করণে স্থানাভাব হ'ল।"

অর্থাৎ কবি দিনেশ দাসকে এই কারণেই সেই ভূমিকায় লিখতে হয়—"এইসব নানা কারণে বর্তমান কাব্যগ্রন্থকে সাম্প্রতিক কালের প্রতিনিধিমূলক কাব্যসংকলন মনে করলে কিছুটা ভুল হবে।"

[২১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ধন্বন্তরি

প্রভাতকুমার গোস্বামী

—'এই যে জনগণ দাদা! আমি আপনাদের নিত্য সঙ্গী। আপনাদের সঙ্গে এই ট্রেন পথে আসি যাই। আপনারা অফিসে-আদালতে চাকুরী করতে আসেন, ব্যবসায় করতে আসেন; আর আমি আসি আপনাদের সেবা করতে। বলতে পারেন এইটাই আমার চাকুরী।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। অতি পরিচিত হকার অনেকেরই। যাঁরা পরিচিত তাঁরা মুখ তুলে তাকালেন, কেউ কেউ হাসলেন একটু। বক্তৃতা চলছেই।

—'জনগণ দাদা, শুনুন। দিনের পর দিন আপনাদের কাছে আমি কত জিনিস বিক্রী করেছি। আপনারা খুসী হয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমিও উপকৃত হয়েছি। কিন্তু আজ আমি অন্যদিনের মতো ঠিক ব্যবসায় করতে আসিনি।'

একথা শুনে কিছু যাত্রী উৎসুক হয়ে তাকালেন।

—'হ্যাঁ দাদা, ঠিক তাই, আমি আজ এসেছি আপনাদের জীবনের একটা বড় সমস্যার সমাধান নিয়ে।'

আরও বেশী যাত্রী উৎসুক হলেন।

—'কিছু মনে করবেন না দাদা। আমরা যে অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি তাতে সংসারে শান্তি বলতে কিছু নেই। অভাব অনটনে মন তো খিঁচিয়ে থাকেই। সংসার চালান যে মা লক্ষ্মীরা আর সংসারের খরচ জোগান দেন যে দাদারা সবাই যেন মারমুখো। কিছু মনে করবেন না জনগণ দাদা। প্রতিদিন প্রতি বাড়ীতে কি দৃশ্য আমরা দেখি? স্ত্রী মুখভারি করে বসে আছেন, স্বামী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন রেগে। আবার স্বামী বেচারা বাড়ী ফিরতেই ঝাঁটা হাতে তাড়া করে এলেন স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হয়। কিন্তু তা যদি প্রতিদিন হয় এবং প্রতিনিয়ত হয় তবে তা মারাত্মক নয় কি? বলবেন দাদা, আমি ছোটমুখে বড় কথা কইছি, কিন্তু কি করবো বলুন। এটাই তো ঘটছে ঘরে ঘরে। তার ফলে সংসারে শান্তি নেই। মনে করুন, আপনারা

যাঁরা অফিস করে বাড়ী ফিরছেন তাঁরা বাড়ী ফিরে কি চাইবেন? চাইবেন সারাদিনের মনের দেহের ক্লান্তি দূর করার মতো পরিবেশ। তা যদি না থাকে, যদি বাড়ী ফিরলেই কেউ তেড়ে আসে, তবে ভাবুন তো কি করবেন? শুনুন জনগণ দাদা। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাটি বন্ধ করে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একটা উপায় আমরা বের করেছি।'

অনেকের সঙ্গে সুশীল দত্ত ও রেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলো। সকাল বেলাতেই সুশীল স্ত্রী অনিমার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করে বেরিয়েছে। বাড়ী ফিরে কি অবস্থার সম্মুখীন হবে তা ভাবতেই তার গায়ে জ্বর আসছিল। তাই তার কৌতূহল বেশী। কিন্তু এ অবস্থা দূর করার উপায়টা কি? —'হ্যাঁ দাদা, উপায় অবশ্যই পাওয়া যাবে। আমি আপনাদের মন্ত্র-তন্ত্র বা তুক্-তাক্-এ বিশ্বাস করতে বলবো না। আপনারা শিক্ষিত লোক। আপনারা অবশ্যই দ্রব্যগুণে বিশ্বাসী। যেমন ধরুন, চুম্বক ধরলে লোহা আকৃষ্ট হয়। আবার আপনারা এটাও দেখেছেন যে বিষধর সাপের সামনে সাপুড়ে একটা বিশেষ শিকড় ধরলে সেই সাপের মাথা নীচু হয়; সে ঝাঁপিতে ঢুকে যায়। এ তো আপনাদের নিজের চোখে দেখা। এমনই একটা শিকড় আমরা আবিষ্কার করেছি, যেটা রণরঙ্গিনী স্ত্রীর সামনে ধরলে আপনাতেই সে শান্ত হয়ে আসবে।'

—'কি দাদা স্ত্রীকে বিষধর সাপ বানিয়ে দিলেন না কি?' একজন যাত্রী প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।

আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার শিকড় কি এক তরফা কাজ করবে? স্ত্রী যদি স্বামীর সামনে শিকড় ধরে?'

—হ্যাঁ, দাদা, এক তরফা নয়, দু'দিকেই আমার শিকড় কাজ করবে। হকার ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি পুরুষ মানুষ হলেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঝগড়াটি স্ত্রীর মতো ঝগড়াটে পুরুষ ও আছে। তাই আমাদের শিকড় যিনিই ব্যবহার করুন অপর পক্ষ নিরস্ত হতে বাধ্য হবে।' একটু থেমে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বলুন কাকে দেবো? লজ্জা করবেন না। সংসারে আমরা শান্তি চাই। এতে লজ্জার কি আছে দাদা?'

প্রথমেই হাত বাড়ালো সুশীল। দাম মাত্র দু'টাকা। এদিক ওদিক দেখে সুশীল শিকড়টা পকেটে পুরলো। সংখ্যায় বেশী নয়। তবে সুশীলের দেখা দেখি আরও কয়েকজন যাত্রী শিকড় কিনলো।

হকার ভদ্রলোক নেমে গেলেন পরের স্টেশনে। নামবার সময় বলে গেলেন—'আমি যাচ্ছি দাদা, দরকার হলে আবার স্মরণ করবেন। আর একটি কথা, শিকড় পকেটে ফেলে রাখলে চলবে না। যখন ঝগড়ার সম্মুখীন হবেন তখন হাতের মুঠোয় ওটাকে শক্ত করে ধরে হাতটা একটু তুলে ধরবেন ঠিক সাপুরের মতো। যত রণরঙ্গিনীই হোক তিনি থেমে যেতে বাধ্য হবেন। আচ্ছা চলি দাদা।'

ঐ স্টেশনে সুশীলেরও নামার কথা। সেও নামলো। কিন্তু হকার ভদ্রলোককে দেখতে পেলো না। সম্ভবত অন্য কামরায় উঠেছেন।

সুশীল ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে পা বাড়ালো। বেশী নয়, ষ্টেশন থেকে এক মাইলের মতো রাস্তা। যেতে যেতে বহু দিনের ঘটনা তার মনে পড়তে থাকলো। কবে রাগ করে সে বাড়ী ছেড়ে দু'দিন বাইরে ছিল, কবে তার স্ত্রী রেগে বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিলেন।

যাওয়াটা কারও পক্ষে স্থায়ী হয়নি। আবার আসতে হয়েছে। অনেক সময় মনে হয় অকারণ ঝগড়াঝাটি। কিন্তু অনিমা কি তা-ই মনে করে?

তার রোজগার বেশী নয়। তবে তার ধারণা হিসেব করে চললে চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অনিমা তা কিছুতেই করবে না। মাছ কিনে আনলে ছুড়ে ফেলে বলবে—'এটুকু মাছ আমি কার পাতে দেব।' মাছ না আনলে বাড়ী তোলপাড় করবে। প্রয়োজনীয় কাপড় জামা সে দিতে পারে না; অপরের মতো আসবাবপত্র নেই। সব নিয়েই বিবাদ। নাম সুশীল হলেও সব সময় সেও সুবোধ বালকের মতো থাকে না। সেও ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

আজকেও একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটার কথা। কারণ, একদিন নয় গত চার পাঁচদিন ধরে তার স্ত্রী ফেরার পথে শিয়ালদহ বাজার থেকে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে যেতে বলেছে। মাছের কাছে দু'দিন গিয়ে সে পিছিয়ে এসেছে। তাই ভেবেছে মাসের প্রথম দিকে একবার চেষ্টা করবে। মাসের শেষে খালি মানিব্যাগ নিয়ে ইলিশ জয় সম্ভব হবে না। কিন্তু অনিমা তা শুনলে তো!

তাই ভয়ে ভয়ে সুশীল বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে সে শিকড়টা হাতের মুঠোয় নিল।

বাড়ীতে ঢুকলো সে। সন্ধ্যা হয়নি তখনও। অনিমা বাড়ীর ভেতরে রোয়াকে বসে ছিল। বাড়ীর বাইরে রাস্তার দিকের দরজা ঠেলে ঢুকে ছোট ওঠোন পার হতে হয়। তারপর রোয়াক।

অনিমাকে দেখেই সুশীলের অবস্থা সঙ্গীন। তার বেশ মনে হলো তাকে আক্রমণের জন্যই সে অপেক্ষা করছে।

সুশীল এগিয়ে যেতেই সে উঠে দাঁড়ালো। প্রতিটি মূহূর্ত সুশীল অপেক্ষা করছিল এইবার ইলিশ মাছ প্রসঙ্গ উঠবে।

কিন্তু না। অনিমা কোনও কথাই বললো না। তার দিকে তাকালো মাত্র। সাহস সঞ্চয় করে শিকড়টাকে হাতের মুঠোয় ধরে সে রোয়াকে উঠে পড়লো। দেখে অনিমার বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ।

দু'জনের মধ্যে সামান্য দূরত্ব। এইবার অনিমা বললো —'কি গো—'

—'কি আবার! অফিস থেকে ফিরলাম।'

—'সে তো রোজই ফেরো।'

—'ফিরিই তো।'

—'তবে?'

—'আমি যে বলেছিলাম' – অনিমার কথা শেষ হতে না হতেই সুশীল হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—'না—আমি পারবো না। পয়সা নেই। তুমি যা খুসী হুকুম করবে তাই মানতে হবে নাকি? না—আমি পারবো না। পারবো না—না।'

—'তবে রে—' বা হাত ওপরে তুলে সেটা নাড়াতে নাড়াতে অগ্রসর হলো অনিমা।

এবার সুশীলের মুষ্টিযুদ্ধ ডান হাতও ওপরে উঠেছে। দু'টো হাতই নড়ছে দু'জনের মাথার ওপরে। কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চুপ।

হঠাৎ সুশীল অনিমার হাত চেপে ধরলো,—'দেখি তোমার বাঁ হাতে ওটা কি?'

অনিমা জোর করে পারলো না। সুশীল ছিনিয়ে নিল হাত থেকে।—দেখে তারই হাতের মতো আর একটি শিকড়। সে হেসে ফেললো।

—'হাসলে যে', বলে অনিমাও হেসে ফেললো।

—'এটা কোথায় পেলে?' জিজ্ঞাসা করলো সুশীল।

—'চাঁদুর মা এনে দিয়েছে। কলকাতা থেকে সকালেব দিকে ফিরবার পথে ট্রেন থেকে কিনেছে আমার জন্যে। খুব ধন্বন্তরি শিকড়।'

—'নিশ্চয়! খুব ধন্বন্তরি—এই দেখ না' হাত খুলে সুশীল দেখালো। —'ও মা! তুমি ও—'

হো হো করে হেসে উঠলো দু'জনেই।

টানাপোড়েন

[তন্তুবায় মুখপত্র]

প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁত-শিল্পের উপর লেখা পাঠান।

সম্পাদক—**হরিপদ বসাক**

বৈঁচা বসাক পাড়া ॥ ফুলিয়া ॥ নদীয়া॥

সৌজন্য বিজ্ঞাপন

সুশান্তর কনে দেখা

মাধব ভট্টাচার্য

সুশান্ত আজ কনে দেখতে যাবে। দু'দিন আগে জরুরী তলব পেয়ে কলকাতা থেকে এসেছে এখানে। পাত্রীটি ভাল। রূপে গুণে স্বভাবে চরিত্রে সব দিক থেকেই মন কাড়ে। বাড়ীর সবারই পছন্দ। সুশান্তর পছন্দ হলেই আর দ্বিমত থাকে না।

সুশান্তদের বাড়ী উত্তরবঙ্গে। আলিপুরদুয়ার। সুশান্ত কলকাতায় থাকে। চাকরী করে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে। বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে সুশান্ত কোনদিনই খুব একটা মাথা ঘামায়নি। নইলে আরোও কিছুদিন আগেই তার বিয়ে হতে পারতো। এই বয়েসের ছেলেমেয়েদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা হলে স্বাভাবিক ভাবেই যে সখ্য গড়ে ওঠে তেমন যে দু'একজনের সঙ্গে তার হয়নি তা' নয় কিন্তু সুশান্ত ব্যাপারটাকে বেশীদূর গড়াতে দেয়নি।

বিকেল হলে সুশান্ত তৈরী হয়ে নিল। মা, ভাইবোন ও দিদিকে নিয়ে তিনটি রিক্সায় চেপে যখন কনে বাড়ী পৌঁছালো তখন প্রায় গোধূলি বেলা।

কনে দেখা হবে আলিপুরদুয়ারেই। সুশান্তদের বাড়ীর কাছাকাছি। এটা ঠিক কনেদের বাড়ী নয়। ওদের এক আত্মীয়ের বাড়ী। ওরা থাকে ভূটান-সীমান্তে চিমাকুঠি। কনের বাবা ওখানে থেকে চাকরী করেন। মেয়ের নাম রীতা। ওরা দু'বোন এক ভাই। ও-ই বড়। এবারে বি. এ. পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছে।

সুশান্তরা পৌঁছালে মেয়ের বাবা-মা সমাদর করে বসালেন। যথাসাধ্য আপ্যায়ণ করলেন। রীতা এলো অনেক বাদে। সুশান্তর ছোট বোন ভেতর ঘরে ঢুকে ওকে হাত ধরে নিয়ে এলো। ও খুব লজ্জা পাচ্ছিলো। সুশান্তর মা রীতাকে পাশে নিয়ে বসলেন। রীতা মাথা নিচু করে বসে রইলো। সুশান্তর মা এবং দিদি কথার মাঝে মাঝে এটা ওটা প্রশ্ন করছিলেন রীতাকে। রীতা সংক্ষেপে জবাব

দিচ্ছিলো। রীতার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার ভাবী বরকে একবার ভালো করে চোখ মেলে দেখে। কিন্তু যখনই তাকাতে গেছে কেমন যেন একটা লজ্জা এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে, চোখ নিমীলিত হয়েছে। এত লোকের মাঝে রীতা ঠিক স্বাভাবিক হতে পারছিল না। একবার শুধু গোপনে তাকাতে গিয়ে সুশান্তর চোখে চোখ পড়ে গেছিলো। সে মুহূর্তের জন্যে। তাতেই রীতার কী লজ্জা! ওর ঠোঁটের ওপর ঘাম ফোঁটা ফোঁটা জমে গেছিলো।

সুশান্ত শেষ অবধি ভেবেছিল এখানেই শেষ নয়। সকলের দেখা হয়ে গেলে রীতাকে রেখে তাঁরা হয়তো পাশের ঘরে যাবেন। একান্তে পরস্পর পরস্পরকে চোখ ভরে দেখার এবং দুটি কথা বলার সুযোগ হয়তো তাঁরা দেবেন। কিন্তু শেষ অবধি তা' আর হয়নি। কনে দেখার পাটটা এভাবে চুকবে তা' সুশান্ত ভাবতে পারেনি। সকলের চোখকে আড়াল করে সে যে দু'একবার মেয়ের দিকে তাকায়নি তা' নয় কিন্তু সে তাকানয় প্রাণ ভরেনি। সুশান্ত মনে মনে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল এই ভেবে যে, যদি একান্তে দেখা হয় তবে কী বলে কথা শুরু করবে। যা ভাবে তাই যেন বেসুরো বেঠিক মনে হয়। বস্তুতঃ শেষ অবধি সে কিছুই ভেবে ওঠতে পারেনি। অবিশ্যি তার আর দরকার হয় নি।

রীতাকে একপলক দেখেই সুশান্তর ভালো লেগেছিল। তাই একান্তে দেখার ইচ্ছেটা খুব তীব্র হচ্ছিলো। কিন্তু মুখ ফুটে সে কাউকে কিছু বলতে পারে নি। অনেকটা অতৃপ্ত মন নিয়েই সে ঘরে ফিরেছিলো। তবে কনে বাড়ীতে ওরা সেদিনই জানিয়ে দিয়ে এসেছিলো—'মেয়ে আমাদের পছন্দ, কোন দাবীদাবা নেই, আগামী আষাঢ় শ্রাবণেই আমরা কাজ করতে ইচ্ছুক।'

ক'দিন বাদেই সুশান্ত কলকাতায় ফিরে এলো। কাজে যোগ দিল। বন্ধুরা ঘিরে ধরলো কনের ফটোর জন্যে।

সুশান্ত রীতার ফটো আনেনি। স্বয়ং দেখে এসেছে ফটো আর চায় কেমনে! ওদের বাড়ীতে অবিশ্যি একটা ফটো দেখেছিল দিদির কাছে। কিন্তু ওটা চাইতে তার কেমন লজ্জা করছিল। তাই

চাইতে পারে নি। সুশান্ত মনে মনে ভেবে নিয়েছিল বিয়েটা শ্রাবনেই হবে। তাই ছুটি বাঁচানোর জন্যে অফিসে হামেশা ডুব মারা বন্ধ করে দিলো।

সুশান্ত কলকাতা চলে আসার কিছুদিন পর রীতার বাবা আর মা একদিন সুশান্তদের আলিপুরদুয়ারের বাড়ীতে গিয়ে সুশান্তর মাকে অনুরোধ করলেন অনুষ্ঠানটি শ্রাবণের পরিবর্তে অগ্রহায়ণে করার জন্যে। রীতার বাবা বললেন—'মেয়ে বিয়ে, আমাকে তৈরী হতে দু'মাস সময় দিন।' সুশান্তর মা বললেন,—আমাদের তো দাবীদাবা কিছু নেই, মেয়েকে তুলে দিন আশীর্বাদ করে।' পরে অবিশ্যি অগ্রহায়ণেই রাজী হয়ে গেলেন।

সুশান্তর দিদি ইতিমধ্যে একদিন সুশান্তর কলকাতার বাসায় এলো। একাকী থাকে সুশান্ত। অগোছালো সংসার। মাঝে মাঝে বিভা আর তার ছোট বোন শোভা এসে এক-আধটু গুছিয়ে দিয়ে যায়। বিভা ও শোভা বাড়ীঅলার মেয়ে। ওরা উপর তলায় থাকে। নীচ তলাটা সুশান্ত ভাড়া নিয়ে থাকে। সুশান্তকে ওরা বাড়ীর একজনই ভাবে। বিভা, শোভাদের দাদা নেই। ওরা সুশান্তকে দাদা বলেই জানে। সুশান্ত খুব ভালো ছেলে। বর্তমান কালে এরকম বিনয়ী, অমায়িক সৎচরিত্রবান ছেলে খুবই দুর্লভ।

সুশান্তর দিদি এসে সপ্তাহখানেক ছিল। এরই মধ্যে ঘরের চেহারা পাল্টে দিয়ে গেলো। একটা ডবল বেডের খাট কিনে আনলো বৌবাজার থেকে, একটা আলনা, ডিনার টেবিল, খান কয়েক চেয়ার, টিপয়, মিটকেস ইত্যাদিতে বসার ঘর, থাকার ঘর, রান্নাঘরের আদল একেবারে পাল্টে গেলো। বোম্বে ডায়িং-এর কাপড়ে জানালা দরজার পর্দা হলো। সুশান্ত দিদিকে বললো, 'জানলা দরজার শ্রী যে পাল্টে গেলো একেবারে।' দিদি বললো —'স্ত্রী এলে শ্রী আরো বাড়বে'। সুশান্ত শুনে মুখ টিপে হাসলো। সুশান্তর দিদিই জানিয়ে গেল বিয়ে শ্রাবণে হচ্ছে না অগ্রহায়ণে। সুশান্ত একটু বিমর্ষ হয়েছিলো বটে কিন্তু তা' বুঝতে দেয়নি। বললো—ভালোই হলো। আমাদেরও টাকা পয়সা

সংগ্রহের ব্যাপার আছে।—কি বল্!

সুশান্তর বাবা নেই। বছর দুই আগে ষ্ট্রোক হয়ে হঠাৎই মারা গেছেন। সুশান্তর দিদি অনিমাই ভাই বোনদের মধ্যে বড়। আলিপুরদুয়ারে একটা মেয়েদের স্কুলে শিক্ষকতা করে। মা আছেন কিন্তু সংসারের মেট্রন সে। বিয়ে করে নি। বাবার অসমাপ্ত কাজগুলো তাকে সেরে যেতে হবে। ভাই-বোনদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বোনের বিয়ে দিতে হবে তারপর তো নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবা। এ সংসার ছেড়ে দূরে চলে গেলে এ কাজগুলো অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। তাই সে দারপরিগ্রহ করে নি।

অলিপুরদুয়ারে সুশান্তদের বেশ কিছু জমি আছে। একটা রইয়ের দেকান আছে। বড়লোক না হলেও অসচ্ছল নয়, সংসারে পর্যাপ্ত কিছু না থাকলেও অনটন নেই।

পুজোর সময় প্রতি বছরই সুশান্ত দেশের বাড়ীতে যায়। এবারও গেলো। দশ দিনের ছুটি। এরই মধ্যে একদিন ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ী এসে আশীর্বাদ করে গেলেন।

কলকাতায় ফিরে আসার আগের দিন সুশান্ত আর তার এক বন্ধু মিলে সিনেমা দেখতে গেছিলো। সিনেমা শেষ হলে হল থেকে বেরিয়ে যখন দুই বন্ধুতে রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করেছে তখন পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো—'ওই ছাখ সুশান্তদা'। সুশান্ত পাশ ফিরে তাকালো, বিস্মিত ভাবে ওদের দিকে তাকিয়েই রইলো।

রীতা আর নীপা। নীপা সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললো—'খুব অবাক হয়ে গেছেন বুঝি তাই না'!

সুশান্ত বললো—হবারইতো কথা।

সুশান্ত তার দু'চোখের সকল দৃষ্টি মেলে রীতার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। রীতা লজ্জা পেয়ে চোখ নামালো। রাঙামুখে খুশীর সলজ্জ হাসি। সুশান্তও খুশীতে হাসলো।

ওরা রাস্তা ছেড়ে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো।

নীপার দিকে তাকিয়ে সুশান্ত জিজ্ঞেস করলো—তোমরা কোথায় এসেছিলে, সিনেমা দেখতে?

নীপা বললো—হ্যাঁ।

রীতার সঙ্গে কীভাবে কথা শুরু করা যায় সুশান্ত ভাবছিলো। এক সময় রীতার দিকে তাকিয়ে ডাকলো—রীতা!—এই প্রথম শব্দ প্রথম ডাক। ডাকতে গিয়ে সুশান্তর গলাটা কেমন কেঁপে উঠলো।

ডাক শুনে রীতার রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হলো, গা শিউরে উঠলো। সে মুখ তুলে সুশান্তর মুখের দিকে তাকালো, মুগ্ধ দু'চোখ ভরে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুশান্ত বললো—তোমাদের কী খুব তাড়া আছে? চলো কোথাও একটু বসি।

ওরা একটু হেঁটে একটা রেষ্টুরেন্টে গিয়ে বসলো। সুশান্ত তার বন্ধুকে রীতা আর নীপার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। নীপা রীতার ছোট বোন। রেষ্টুরেন্টে বসে সুশান্ত নীপাকে বললো—কী খাবে?

নীপা বললো—আপাতত মিষ্টি খাব। তবে আজকের এই যোগাযোগের জন্য দু'জনের কাছেই বড় কিছু প্রেজেন্ট পাওনা রইলো। দু'জনে পরে তা শোধ করবেন। রীতা হাসলো। সুশান্তও রীতার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলো। বেশ চওড়া ফাঁকা রাস্তা। এ রকম রাস্তায় হাঁটতে বেশ ভালো লাগে। সুশান্ত রীতাকে বললো—'এখানে কবে এসেছো'!

রীতা বললো—'আজ চার দিন'। পরশুই চলে যাব।

সুশান্ত কৌতুক ক'রে বললো—'কলকাতা যাবে কবে'?

রীতা বললো—'তুমি যেদিন নিয়ে যাবে'।

রীতার মুখ থেকে এই প্রথম 'তুমি' ডাক শুনলো সুশান্ত। সুশান্ত অকস্মাৎ রীতার হাতখানা তার মুঠিতে চেপে ধরলো। রীতার সর্বাঙ্গ শিহরণে কেঁপে উঠলো কিন্তু হাতখানা সরিয়ে নিতে চাইলো না।

রীতা সুশান্তকে বললো—'তুমি আর ক'দিন এখানে আছো'।

সুশান্ত বললো—আগামী কাল চলে যাচ্ছি।

—কালই চলে যাচ্ছ!

—হ্যাঁ

—আবার কবে আসবে?

সুশান্ত বললো—এরপর বোধহয় তোমাকে নিতেই আসবো।

—সত্যি আসবে তো!

—কেন, আর কীসের সংশয়?

রীতা কী বলবে ভেবে পেলোনা। খানিক পরে বললো,—'না এমনি—আমাকে তোমার কেমন লাগলো তাতো জানি না।'

সুশান্তর মুখখানা সুখানুভূতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সুশান্ত এক সময় বললো—'তোমাদের আর আটকাবো না'। একটা রিক্সা ডাকলো সুশান্ত। রীতা বললো—তোমার কলকাতার ঠিকানাটা আমায় দেবে। সুশান্ত তার বেলেঘাটার ঠিকানাটা লিখতে লিখতে বললো—অকস্মাৎ কোনদিন উঠে আমায় অবাক করে দেবে নাকি?

রীতা বললো—সশরীরে না হোক যদি কোনদিন কোনো খেয়ালে আমার অন্তরের প্রতিচ্ছবি লিখে পাঠাই তবে তা তুমি গ্রহণ করো।

ওদের নিয়ে রিক্সা ছেড়ে দিলো। রীতা আর নীপা পেছন ফিরে তাকিয়ে রইলো। রিক্সা ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হতে এক-সময় সুশান্তকে অদৃশ্য করে দিলো।

সৈকত—এর নাম পরিবর্তন—

এখন থেকে সাহিত্য সৈকত

সনেট

অজিৎকুমার রায়

শোষণ আর শাসন চলেছে সমানে,
জটিল দ্বন্দ্ব সর্বত্র শ্রেণীতে শ্রেণীতে।
দিন এসেছে এবার মাঠে ময়দানে!
মোকাবিলা হবে তাই পৌষ মাঘ শীতে।
চাষী যিনি জমি তার এইটাই জানি,
ন্যায্য প্রাপ্য তারই তো লাঙ্গল ধরে যে;
আকাশ পাতাল আজ ভাবে ধনী মানি
কড়ায় গণ্ডায় জব্দ এ কথা জানে সে।

তবু কেন হয় না সে সহজ সরল!
শোষণে শোষণে মন এতই পাষাণ
হতে পারে মানুষের? কেমনে তরল
হবে! পূর্বপুরুষের সেও তো সন্তান।

গরীব কাঁদিয়ে ভাই পাবে না রেহাই
শোষণ ও শাসনের প্রতিবাদ চাই।

শতবর্ষে বিধানচন্দ্র স্মরণে

রতনকুমার বসাক

কেউ কেউ প্রবাদেও যেমন বেঁচে থাকেন
তিনি ছিলেন নিজেই প্রবাদ পুরুষ।

কেউ কেউ যেভাবে জানে সেভাবে নয়,
অথবা স্বভাবে উদ্ভিজ্জ ছায়ার কাছে—
তিনি জীবনের পল্লবিত ঋণ রেখে যান
অনন্য সেই ভাস্কর খোদাই আছে।

কেউ কেউ প্রবাদেও যেমন বেঁচে থাকেন
তিনি ছিলেন নিজেই প্রবাদ পুরুষ!

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বিষয়ে

[৮ পৃষ্ঠার পর]

আমার মনে হয়েছিল 'কিছুটা' কেন ?—সবটাই কেমন যেন বিভ্রান্তিজনক। তবে, সে-বইও একটি দলিল বটে। অমর ষড়ংগী —যিনি ১৯৩১-এর জাতক, তিনি সেই বইয়ের আগে বা পরে কোনো স্মরণীয় কবিতা লিখে থাকলেও আজ ১৯৮১-তে সেসব কিছুই আর মনে পড়ে না। দুর্গাদাস সরকার (১৯২৭-৭৬) চমৎকার মানুষ এবং সম্ভাবনাময় কবি ছিলেন—খুবই সংগ্রামে জীবন যাপন করতে হয়েছে তাঁকে ; তিনি আজ আর নেই। শান্তশীল দাশ (জন্ম ১৯১৯) আমার চেয়ে বয়সে বছর-দুয়েকের ছোটো, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি (জন্ম ১৯২২) পাঁচ-বছরের মতো,—হেনা হালদারও (জন্ম ১৯২২) তাই,—শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবর্ষের উল্লেখই ছিল না, কিন্তু তাঁর কবিতায় বেশ রোমান্টিক মাবর্ষ ও বেদনা ছিল বলে মনে আছে। শোভন সোম (১৯৩৪) ছিলেন, সামসুল হক (১৯৩৬) ছিলেন—যাঁরা পরে আরো লিখেছেন, লিখছেন—কিন্তু আরো অনেকেই ছিলেন না—যাঁদের থাকা উচিৎ ছিল। তবে, সেকথা যাক্। কবিতা-সংকলন মাত্রেরই আধার সীমিত। সেটা তো বিবেচ্য বটেই—এবং সেই কারণেই সংকলন-টংকলনের কথা উহ্য রেখে মোটামুটি ১৯৬০/৬১ থেকে ১৯৮০/৮১ পর্যন্ত প্রায় বিশ বছরের বাংলা কবিতার মেজাজ কীরকম, সে বিষয়ে কিছু ভাবা যেতে পারে। ১৯৬০-এর আগেই সুকান্ত ভট্টাচার্য (বাংলা ১৩৩৩-১৩৫৪) লোকান্তরিত হয়েছেন এবং ১৯৭৪-এ গেছেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)।

১৯৭৬-এ 'নাভানা' প্রকাশনলয় থেকে ডঃ সুশীল রায় সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ' নামে ৩৮৮ পৃষ্ঠার যে চমৎকার গদ্যরচনা-সংগ্রহ বেরোয়, তাতে 'সাম্প্রিতিক কবিতার বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য' নামে অধ্যাপক ও কবি ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তীর একটি লেখার শেষদিকের কয়েক ছত্র এখানে তুলে দিলে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে বোঝা যাবে। তিনি লেখেন—"আধুনিক কাব্যের এক

জনাকীর্ণ অংশ আধুনিক হবার জন্য যত ব্যগ্র ও পরিশ্রমী, সার্থক কবিতা হবার জন্য তার শতাংশও নয়। যা সত্যিকারের নবীন তা পুরাতনকে জয় করে, ভয় করে না। ছলা দিয়ে কলার অভাব শেষ পর্যন্ত ঢাকা যায় না একথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। কোনো কালেই আধুনিক না হয়ে সার্থক কবিতা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সার্থক কবিতা না হয়েও আধুনিক কবিতা হতে পারে এবং ঝুড়ি ঝুড়ি হচ্ছেও। বস্ত্রহরণের মধ্যে দৌপদী নায়িকা হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু হৃতবস্ত্রা মাত্রেই নায়িকা, আধুনিক কবিতার জন্য একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না।"

সেই বইয়েই সম্পাদক ডঃ সুশীল রায় লেখেন 'একালের কবিতা' নামে নিবন্ধ—যেটিতে তিনি 'আধুনিক' কথাটির ওপর খুব বেশি জোর দিতে নিষেধ করেছিলেন যেমন সেই বইয়েই 'বাংলা কবিতার পালাবদল ১৯১০-১৯৪৭' নামে আমার নিজের প্রবন্ধটিতেও আমি লিখি—"দোহাই আপনাদের—'আধুনিক কবিতা' বলে কবিতার কোনো পৃথক জাতির কথা বলবেন না। হয় ভাল কবিতা, নয় মাঝারি কবিতা, নয় তুচ্ছ। আরো সংক্ষেপে, হয় 'কবিতা' নয় 'অকবিতা'।" সুশীলবাবু আমারই মতন দশকে-দশকে ভাগ করে কবিতার বিশেষত্ব দেখার বিরোধী। হাঁ, আমরা উভয়েই এবং আরো অনেকেই এসব রেওয়াজ পছন্দ করিনা। তবু কতকটা নিরুপায় বোধ ক'রেই যেন তিনি 'পঞ্চাশের কবি' বলে যাঁরা চিহ্নিত হয়েছেন, সেরকম বত্রিশ জনের নাম করে তাঁদের বিশেষত্বের দিকগুলি দেখিয়েছেন। তারপর আর এগোন নি—অর্থাৎ ষাটের দশকেও নয়,—পরবর্তী কয়েক বছরেও নয়।

তাহলে ১৯৬০/৬১ থেকে ১৯৮০/৮১ পর্যন্ত প্রায় দুই দশকে বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি যাচ্ছে কোন্ দিকে?—এই প্রশ্ন থেকেই যায়। এ-বিষয়ে আমি পাঠক হিসেবে যা লক্ষ্য করছি তা সংক্ষেপেই বলা যেতে পারে—এবং কোনো বিশেষ লেখকের

নাম না করেই। জগন্নাথ চক্রবর্তীর মন্তব্যই মোটামুটি আমার পছন্দ হয়। কায়দা দেখাবার চেষ্টা যতোটা দেখতে পাই, কবিতার অবিস্মরণীয় অকৃত্রিম স্বাদ সে অনুপাতে সামান্যই চোখে পড়ে। আমাদের সত্যিকার কোনো বড়ো সাহিত্য-পত্রিকা এখন কোথায়? যে মুষ্টিমেয় বহুল-প্রচারিত পত্রিকা আছে—যাঁরা কবিতার জন্যে কিছু সম্মান-দক্ষিণাও দিয়ে থাকেন, সেইসব পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে যাঁদের ওপর প্রকাশযোগ্য কবিতা বাছাইয়ের দায়িত্ব আছে হয় তাঁরা নিজেদের কাজে অবহেলা করছেন, না-হয় অন্তত গত দশ বছরের মধ্যে তেমন শক্তিমান নতুন কোনো কবি-ই আর দেখা দেননি। পুরোনো পরিচিত যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও অনেকেই সেইসব পত্রিকার দ্বারা পরিত্যক্ত। বিভিন্ন স্বার্থ—বিভিন্ন দুষ্ট-চক্র এখন ভাল কবিতার শত্রু। যাঁদের যেটুকু সম্মান বা সমাদর প্রাপ্য, তাঁরা তা পাচ্ছেন না। ফলে, প্রবীণ কবিরা যাঁরা বিশেষ পাত্তা না পেয়ে দূরে সরে আছেন তাঁরাও লিখছেন তো বটেই —লিখছেন 'ছোটো-পত্রিকা'য় বিনা দক্ষিণায়। তাঁদের মন তিতিবিরক্ত। যাঁরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক, তাঁরা অনেকেই শুনেছি সাধ্যানুসারে লেগে আছেন খ্যাতির লোভে'। সেটা স্বাভাবিক যাঁরা বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কারও-কারও দালাল আসেন কখনো-কখনো। কিন্তু সেই দালাল-দের নামোল্লেখ করা সম্ভব নয়, কারণ তাঁদের কোনো লিখিত দলিল তো তাঁরা রেখে যান না।

এইসব তিক্ত কথা বলতে হচ্ছে বটে, কিন্তু এও স্বীকার্য যে, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এবং অল্প বয়সে খ্যাতির একটু বেশি লোভ থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত ষাটের দশকে ভাল বাংলা কবিতার যেটুকু—যে কয়েক ছত্রও লেখা হয়েছে, সত্তরের দশকে সে-তুলনায় তা আরো কম ঘটেছে। ছোটো পত্রিকারা তবু বেঁচে থাক্। সেই সব বাহনেই হয়তো সত্যিকার নতুন কবিতা আবার দেখা দেবে। কবিতার অন্ধকার উচ্ছৃঙ্খলতার ঋতু শেষ হয়ে নতুনতর প্রতিষ্ঠার দিন সম্ভব করে তোলবার জন্যেই অর্থনীতি,

সমাজনীতি, ধর্মবোধ, প্রেম ইত্যাদির সুস্থ বিকাশ ঘটা দরকার। আমরা কেমন যেন অনুন্নত, অর্ধশিক্ষিত, স্বার্থপর, জীব বনে যাচ্ছি ক্রমশ। বাংলায় কবিতা এখন গতানুগতিক-ভাবে সাম্প্রতিক- এবং 'ছড়া'-রই এখন ছড়াছড়ি।

ফেরী ক'রে ফেরা

ঈশান চন্দ্র মিশ্র

উন্মত্ত ঝঞ্ঝার গতি
যৌবনের অবরুদ্ধ দামামা
ফুঁকে যাও শিঙা হে মহাকাল,
শেখোনিতো বিপদেও থামা।
ভাবোনিতো কোনোদিনও
ভোগের উত্তুঙ্গে চড়ে বসে
চড়াই উতরাই আছে
আছে শূন্য অবশেষে।
কি করবে বল আজ
সহবৎ শিখলে না তো তবু,
লাগামে দিলেই টান
ঢিলে দিতে পারোনা যে কভু।
যে আছাড় খেলে আজ
জীবনের অন্তিম শিক্ষণ
সময় যে নাই আর ভাই
সরি, বড় ঢিলে তালে অনুবীক্ষণ।

আশ্রয়

কাকলি ভট্টাচার্য

বিকেল হয়ে এসেছে। শোভন তার হুইল চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল খুব মন দিয়ে। সুনন্দা কখন তার ঘরে এসেছে সে টের পায়নি। খুট্ করে কপাটের আওয়াজ হতে চমকে গেল। সুনন্দা মিটি মিটি হাসছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

—'বাব্বা, তুমি এমন মনযোগ সহকারে বই পড়ছো যে, একটা মানুষ ঘরে এলো টেরও পেলেনা! তুমি যদি স্কুল-কলেজে গিয়ে পড়াশুনো করতে তা হলে একজন পণ্ডিত হয়ে যেতে ভবিষ্যতে। আমিতো বই নিয়ে একদম বসতেই পারি না, আমার হাত-পা কামড়াতে থাকে। এ জন্যে সত্যিই তোমকে হিংসে হয় খুব'। খুব হাল্কা সুরে কথা ক'টি বলে সুনন্দা হাসতে লাগলো। কিন্তু শোভনের বুকের গোপন কোণে কথাগুলি বড়শির মত বিঁধে গেল সজোরে। মুহূর্তে তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। তার একাকী মরুময় জীবনে সবুজ রেখা বড়ই অল্প। সে আজন্ম অচল হয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। মায়ের কোলে হয়ে শিশু বয়সে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ এসেছে খুবই কম। তার অকেজো-শুকনো দুটি পা কোমর থেকে ঝুলে আছে। ডান পায়ে অল্প জোর পেলেও বাঁ পায়ে একটুও সাড় নেই। তাই তার সারাদিনের সঙ্গী এই হুইল চেয়ার আর বই। চেয়ারে বসে সে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে জানালা দিয়ে আকাশ-গাছ-পাতা যা কিছু দেখা যায় তাই দেখে তার অতৃপ্ত আত্মাকে সুখী করায়। এইটাই শোভনের বড় কষ্ট, বড় অভিমান ভগবানের প্রতি। তার শরীরের উপরের অংশটুকু খুবই পরিপুষ্ট এবং স্বাস্থ্যবান। এ স্বাস্থ্য দিয়ে তার কি হবে যদি সে কোন কাজ না-ই করতে পারলো। এই অসহায় জীবনের গ্লানি সে আজীবন বইবে কেমন করে! আর দশটা সুস্থ ছেলের মত নিজস্ব হাঁটার

ক্ষমতা তার নেই কিন্তু মনের আবেগ-সুখ-দুঃখ অনুভূতি ভগবান দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেন নাই। হৃদয়ের এই অজস্র সম্পদ নিয়ে সে কি করবে, যদি এর বিনিময় কারও সঙ্গে করতে না-ই পারলো।

সুনন্দা লক্ষ্য করলো শোভন খুব গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সে খুব দুঃখিত গলায় বললো,-'আমি কি ব্যথা দিলাম তোমায়? আমি কিন্তু দুঃখ দিতে তোমায় এ কথা বলিনি।' শোভন বললো,—'জানি আমি, তবুতো কোন সময় ভুলতে পারিনা যে এ সমাজের আমি একজন অকর্মন্য মানুষ। এ ব্যথা আমার বুকের গভীরে বসে আমায় নাড়া দেয় অহরহ। জীবনটা প্রতিদিন একই ভাবে কেটে যায়। কোন বৈচিত্র্য নাই এ জীবনে। জানো, এ বন্দী জীবন আর ভালো লাগে না। এ কথা শুনে সুনন্দার মুখটা ব্যথায় ভ'রে গেল। এই দুঃখের মুহূর্তগুলোতে সে শোভনকে সান্ত্বনা দিতে পারে না।

সুনন্দারা পাশের বাড়িতেই থাকে। প্রতিদিন সে একবার এ বাড়িতে আসে। শোভনের মা মিসেস বেলিয়াপ্পা তাকে খুব স্নেহ করেন। সে কলেজ থেকে ফিরে রোজ একবার মাসীমার সঙ্গে দেখা করে যায়। শোভনের কোন বোন নেই বলে সুনন্দাকেই মেয়ের মত দেখেন তিনি। শোভনের মনটা হাল্কা করার জন্য সুনন্দা জিজ্ঞেস করলো—'মাসীমা ফেরেননি এখনও স্কুল থেকে?' শোভন বললো—'ঘরে এসে বোস।' মা স্কুল থেকে দোকানে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করে ফিরবেন। সুনন্দা বললো তবে এখন আমি আসি, পরে এক সময় আসবো। শোভন নির্লিপ্ত স্বরে বললো, 'যাবে, তবে যাও'।

সুনন্দা চলে গেলে শোভন আবার বইটা খুললো অন্যমনস্ক ভাবে। কিন্তু দুহাতের পাতায় বইটা খোলাই রইল। একাকী নির্জন ঘরে তার উদাস মনটা জানালার ফাঁক গলে মেঘের পিঠে সওয়ার হয়ে কোন্ অচীন দূর দেশে চলে গেল। অতি কষ্টে স্মৃতির কয়েকটা ছেঁড়া পাতা বার বার ভেসে উঠে তার চোখের সামনে। তার শিশু বয়স তখন। মা সারাক্ষণ তাকে যত্ন করেন, আগলে রাখেন।

মা যেন কি সব তেল এনে পায়ে মালিশ করতেন, জলপড়া খাওয়াতেন, মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতেন। বাবা বিরক্ত হয়ে বলতেন—এ আর কোনদিন ভাল হবে না, মিছেই তুমি পরিশ্রম করছো। খুব কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। পাণ্ডিত্য ছিল প্রখর। কিন্তু রেগে গেলে মাকে শাসিয়ে কথাবার্তা বলতেন। সে কথা এবং সে সব ভাষাও আজ শোভনের নিকট অস্পষ্ট তবে একটা কথা স্পষ্ট মনে আছে, বাবা মাকে বলেছিলেন—'তোমার দোষেই তোমার ছেলে এমন নুলো হয়েছে।' মা আর সহ্য করতে না পেরে সরবে প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপরে মায়ের সঙ্গে অশান্তি লেগেই থাকতো। কোনদিন রাত্রে বাড়ি ফিরতেন তিনি কোনদিন ফিরতেন না। একদিন খুব কথা কাটাকাটি করে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেননি। সেদিন শোভনের বোধশক্তি এত প্রবল ছিল না কিন্তু আজ সে অনুভবে তা বোঝে। মা সেদিন কি পরিমাণ অপমানিত হয়ে এবং বিপদে পড়ে অনেক ঘুরে ঘুরে এই মাষ্টারীটা জোগাড় করেছিলেন। তার জন্যেই তার বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন ভাবলে হৃদয় মথিত করে একটা কান্নার ঢেউ আছড়ে পড়ে গলার কাছে এসে। মাকে এ ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করে মায়ের ব্যথিত ছলো ছলো আঁখি দেখে এর উত্তর আর পাওয়া হয়নি।

কোন কোন বিশেষ দুর্বল মুহূর্তে শোভন নিজের কথা ভাবে। সুনন্দাকে তার খুব পছন্দ কিন্তু তার ভাবনায় রঙিন সুতোর জালবোনা হয়না তার কল্পনা পাখনা মেলে উড়তে গিয়ে আছড়ে পড়ে শক্ত মাটিতে। নিজের অচল নিষ্ক্রিয় পা-দুটোর কথা ভেবে মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস হয়না সুনন্দাকে। তারমা-বাবার বিচ্ছেদে তার কাছে প্রেম-ভালবাসা ক্ষণভঙ্গুর বলে বোধহয়। তার এই অপাঙতেয় জীবন নিয়ে কাউকে কি ভালবাসা যায়! এই ছন্দহীন জীবনের সুখ কোথায়! এভাবে বাঁচার মূল্য সে নিজেই খুঁজে পায় না।

চোখ দুটি বন্ধ করে কপালে দু-হাত চেপে ধরে অশান্ত মনটাকে থামাতে চেষ্টা করে শোভন। মাথায় একটি নরম হাতের স্নেহের পরশ পেয়ে চোখ খুলে চমকে পেছন ফিরে তাকায় সে।

তার মা মিসেস বেলিয়াপ্পা কখন ফিরেছেন সে টের পায়নি। শ্রান্ত ক্লান্ত চোখ দুটি যথাসম্ভব উজ্জ্বল করে, হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন—'ভাল আছিস তো? শরীর সুস্থ তো?' শোভন মাথা নাড়লো। মা আবার জিজ্ঞেস করলেন—'তবে এমন শুকনো মুখে বসে আছিস কেন? কিছু ভাবিস না আমি তো আছি তোর কাছে।' বলে মাথায়-পিঠে আদরে হাতটা বুলিয়ে দিলেন কয়েকবার। যখন শোভন আপন চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়ে মায়ের এই স্নেহময় কথাগুলি শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা-দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেয় নিমেষে।

কালের প্রহরী

দীপক ছোতা

এখন সকলে ঘুমোচ্ছে—
ওরা সব ক্লান্ত, শ্রান্ত, বেদনার বিষণ্ণ প্রকাশ
চেয়ে দেখো! এখানেও রক্তের দাগ
বৃটিশের বেয়োনেট ভিজিয়েছে —
আমাদের স্বাধীনতা। বিপ্লবের লাল ঘাসে—
শুয়ে আছে আমাদের রক্তাক্ত লাশ।
পরাধীনতা মুছে গেছে চৌত্রিশ বছর···
এখনো কি শোননাকো গুলির আওয়াজ?
কত প্রাণ ঝরে যায় আজো
সহস্র মায়ের বুক আর্তনাদে কাঁদে
মৃত্যুকে সামনে রেখে যারা শুধু
পাল্লা কষে দিন রাত বাঁচার তাগিদে
শান্তির ললিত বাণী শুনায়েছে তাদের
বঞ্চনা ও বুভুক্ষার মিথ্যে ইতিহাস।
তবু বেঁচে আছে আমাদের সেই স্বাধীনতা
বেঁচে আছে হৃদয়ের দুঃস্বপ্ন নিয়ে
বিবর্ণ করেছে মন হাজারো তরুণের
চারিদিকে শঠতার বাড়ন্ত দেওয়াল
বিবেক খেয়েছে মার জীবনের বিস্তীর্ণ আঁধারে
অথচ, তুমি শুধু জেগে আছো—কালের প্রহরী।

নতুন বই

আমাদের শান্তিনিকেতন : ঈশানচন্দ্র মিশ্র ও মমতা সেন মিশ্র। আনন্দভবন, ২৮, আনন্দগড়, কলিকাতা—৭০০০৫৬।

মূল্য—চার টাকা

বইটির নিবেদন-এ প্রকাশক বলেছেন : 'বৎসরব্যাপী নানা উৎসব অনুষ্ঠান, সভা-সম্মিলন উপলক্ষ করে লক্ষাধিক, হয়ত বা লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতনে। অনেক সময়েই মনে হয়েছে, এঁরা আসেন, দেখেন, শোনেন, ফিরে যান। প্রধানত এঁদের হাতে তুলে দেবার জন্যই 'আমাদের শান্তিনিকেতন'-এর পরিকল্পনা ও প্রকাশনা।' সাধারণ ভ্রমণ-পিপাসুরা একদিনের একটা ঝটিতি সফরে তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতনে আসেন, দেখেন, স্থানের মাহাত্ম্য শোনেন ও ফিরে যান ঠিকই কিন্তু এই দেখা-শোনার মধ্যে ভ্রমণ পিপাসুদের তৃষ্ণা মেটে না। তাঁদের এই অতৃপ্ত বাসনাকে অনেকাংশে তৃপ্ত করতে সফল হয়েছেন বর্তমান বইটির লেখক-লেখিকা যাঁদের পূর্ব্ব-পরিচয় : প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, সঙ্গীত ভবন, শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনকে লেখক-লেখিকা খুব কাছ থেকে দেখেছেন জেনেছেন। বেশ কিছু-কাল খোয়াই-এর ধূ-ধূ প্রান্তর, কোপাই নদীর ভরা জোয়ার, শালবীথিতে ঝড়ের দোলা এবং আম্রকুঞ্জে মাধবীবিতানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরা হৃদয় দিয়ে শুনেছেন। বইটির বিষয়-সূচীকে তিন ভাগে (১ম ভাগ—পূর্বকথা, ২য় ভাগ—আমাদের শান্তিনিকেতন, ৩য় ভাগ—শ্রীনিকেতন) ভাগ করা হয়েছে। এককথায় বইটি শান্তিনিকেতন ভ্রমণের অপরিহার্য গাইড বুক। এতে শান্তিনিকেতনের উৎপত্তি ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান-সূচী, মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান, রেলপথের সময় নির্দেশিকা, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ আছে। বইটির শেষে লেখক শান্তিনিকেতনের একটি মানচিত্র দিয়ে শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতন-এর অবস্থান ও তার বিভিন্ন

দ্রষ্টব্যস্থান ছবির মত বুঝিয়ে দিয়েছেন। বইটিতে বিশ্ব-কবির পরম-বন্ধু দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এ্যানড্রুজ, কৃষিবিজ্ঞানী এল, কে, এলম্‌-হার্সট্‌ এবং শান্তিনিকেতনের আভ্যন্তরীণ দৃশ্যের কিছু আলোক-চিত্র আছে। কলা ভবনের (শান্তিনিকেতন) প্রাক্তন ছাত্র পিনাকী বড়ুয়া ও সুরঞ্জন বসু যথাক্রমে প্রচ্ছদ ও মন্দির স্কেচ নির্মাণে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পরিশেষে জগদীশ ঘোষ-এর উপযুক্ত নামকরণ বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

—সাগরময় অধিকারী

মহাপুরুষ (২য় সং) শ্রীতারক হালদার সাহিত্যরত্ন, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিশহর, ২৪ পরগণা। মূল্য—ছয় টাকা।

শ্রীতারক হালদার মহাশয়ের "মহাপুরুষ" নাটকের বইখানি ঠাকুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেবের জীবনালেখ্য। নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীনিগমানন্দের আধ্যাত্মিক জীবনে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। লেখক গ্রন্থ স্বত্ব আসাম বঙ্গীয় স্বারস্বত মঠকে দান করে দিয়েছেন। নাটকটি বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—দিলীপকুমার ভট্টাচার্য

ক্রমবিবর্ধমান ভারত : শ্রীঅন্নদা মুন্সী, ঋক প্রকাশনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য—পাঁচ টাকা

শ্রীঅন্নদা মুন্সী তাঁর বর্তমান বই-এর এক জায়গায় অর্জুনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'ভারতের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। ভারতবাসীরা নিজেদের ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে কখনও রাশিয়া কখনও আমেরিকা থেকে ধার করা মতবাদগুলো মূর্খ দরিদ্র ভারত-বাসীর ওপরে চাপিয়ে চলেছে'...আবার কৃষ্ণ বলছেন—'ভারতও কম নয়। তারাও বিদেশীদের কানে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন্ত্র দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

এমন ব্যাঙ্গাত্মক রাজনৈতিক রচনা আজকাল প্রায় লেখাই হয়না। বইটি পড়লে সকলেই উপকৃত হবেন। —মাঃ ভঃ

পশ্চিম বাংলার বেকার ভাই-বোনেদের জন্যে আমরা একটা স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। পারিশ্রমিক আপনার কাজ ও দক্ষতার উপর নির্ভর করছে। আমরা মাসের ১লা তারিখে আপনার হাতে ঠিক মাইনের কিছু টাকা গুণে দেবো না। তবে আপনি নিজেই হিসেব করে দেখবেন মাস গেলে রোজগার হাজার ছুঁই ছুঁই করছে।

হ্যাঁ সত্যি তাই! অবাক হবার কিছু নেই। আমরা আপনাকে ঠিক চাকুরীয়া নয় ব্যবসায়ী করে তুলবো। পুঁজিহীন ব্যবসা। ইতিমধ্যেই অনেক শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে আমাদের তৈরী **'টাঙ্গাইল শাড়ী'র** ব্যবসায় নেমে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। আপনিও নিজেকে স্বনির্ভর করে তুলুন।

আবেদন-পত্র হাতে নিয়ে সরাসরি যোগাযোগ করুন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ। সঙ্গে সঙ্গে রোজগার।

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমিতি লিঃ

টাঙ্গাইল তন্তুজীবি উন্নয়ণ সমবায় সমিতি লিঃ

বৈঁচা বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া।

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য * প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া।
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

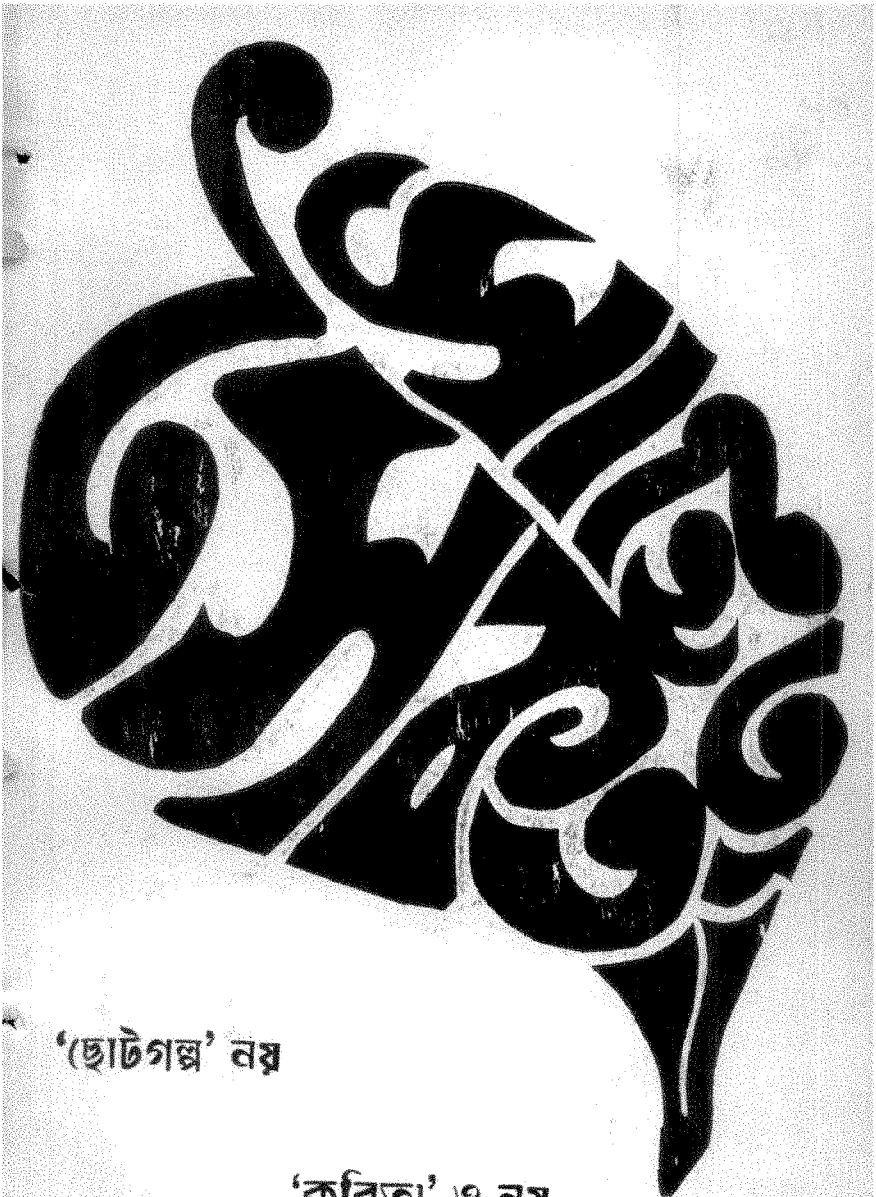

'ছোটগল্প' নয়

'কবিতা' ও নয়

নোতুনের নাম—'ছোবিতা'

সাহিত্য সৈকত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ১ * সংখ্যা ২

মাঘ—চৈত্র ১৩৮৮/জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৮২

সম্পাদকীয়

আমাদের সমুখের পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু ঘটছে। —তার কিছু চোখে দেখা যায় কিছু দেখা যায় না। —যা দেখা যায় তার যেমনি একটা রূপ আছে অবয়ব আছে প্রকাশ আছে, আবার যা দেখা যায় না তারও একটা রূপ আছে গন্ধ আছে নেই শুধু প্রকাশ।

একদিন অপ্রকাশেরও প্রকাশ ঘটে। মানুষের দৃষ্টির সমুখে এসে সে দাঁড়ায়। মানুষ তাকে চিনে নেয়—আপনার করে নেয়।

মানুষের সংসারে যেমনি নতুনের আবির্ভাব ঘটে সাহিত্যের সংসারেও নতুনের জন্ম হয়। নতুন মুখের ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম নেয় নতুন নতুন ফর্মের।

"ছোটগল্প" এবং "কবিতা" নামের চিহ্নিত সাহিত্য মলাটের ভেতরের রূপটা অনেকাংশেই পাল্টে গেছে। যে নতুন রূপের জন্ম হয়েছে তার স্বনামে পরিচয় ঘটেনি আজও। আমরা এর একটা নতুন নাম দিতে চাই। —প্রাবন্ধিক শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ রায় এই কাজটি করেছেন। এই নতুনের নামকরণ করেছেন তিনি —"ছোবিতা।"

"সাহিত্য সৈকত" এর বর্তমান সংখ্যায় "ছোবিতা" শিরোনামেই এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখে বিস্তারিত বলেছেন তিনি। যার মূল কথা, তাঁরই ভাষায়—"আজকের দিনের কবিতা, আর সেকেলে ঢংয়ের ছড়ার পোষাকে নেই। এমন কি আধুনিক ছোট গল্পও তার গত শতকের শতকিয়া আউড়াতে চায়না। সেই সৃজনশীল শিল্পের ঐ দু'পক্ষ মিলে গেছে এক রসায়নিক যৌগিকে —যার নাম ছোবিতা।"

"ছোবিতা" শব্দটি একেবারে নতুন। অভিধানে এখনও এর স্থান হয়নি। শ্রীযুক্ত রায় "ছোটগল্প" এবং "কবিতা" কে এক পাত্রে মিলাতে গিয়ে ছোটগল্পের আদ্যাক্ষর "ছো" এবং "কবিতা"র মধ্যমা ও কনিষ্ঠা যথাক্রমে "বি" এবং "তা" এ দু'টোকে বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ ছো+বিতা=ছোবিতা।

নতুন শব্দে এক নতুনের নামকরণ করে পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। এর পরের ভাবনা পাঠকের।

কবিতার পাত্র থেকে একেবারে ছোটগল্পের পাতে এসে মিশেছে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের—"চিন্তা"।

গোটা পশ্চিমবাংলার মন্দিরের গায়ে যেখানে যত রামায়ণের চিত্র খোদাই করা আছে তার সমীক্ষা করেছেন শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা "বাংলার মন্দিরে রামায়ণ কাহিনী" প্রবন্ধে।

চেখভের কিস্ (Kiss) গল্পের অনুসরণে একটি গল্প লিখেছেন শ্রীমতী তৃপ্তি রায় এবং মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের গ্রামবাসীদের একেবারে মুখের কথা গল্পের ভাষায় রূপ দিয়েছেন শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য। "ক্ষণিকের স্মৃতি "গল্পে শ্রীরতন কুমার দাস চলন্ত বাসে বইয়ের দোকানের সন্ধান দিয়েছেন পাঠককে।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীরাজ সুশান্ত মিত্র।

ছোবিতা

ধীরানন্দ রায়

কথায় বলে,—"রূপ-গুণ"।

তার মানে, প্রতিটি রূপেরই এক একটি বিশেষ গুণ থাকতে বাধ্য। আর গুণের বদল হ'লে; রূপটা, না বদলে আর যায় কোথায়!

এমনি ভাবেই আমাদের সাহিত্যের রূপের রংটা বদলেছে, সময়-কালের, গুণ বদলের সংগে সাথেই!

ধরা যাক মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের কথা। লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টি করে, আর তাদের তুষ্ট করে বাঁচার চেষ্টায় যে কাব্য লাচাড়ীর আছাড়ি-পিছাড়িতে রূপ পেয়েছিল, কাল বদলের গুণে, তা শ্রোতার আসর থেকে বিদায় নিল।

—এমন কি বিহারীলাল যখন "সারদা মঙ্গল" লিখলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যটা ঘনরাম বা মুকুন্দরামের পথ ধরে তো চলেই নি, এমন কি ভারতচন্দ্রের ভারত থেকে, অন্য এক জগৎমুখী হয়ে উঠেছিল তা। —আর কে না জানে, রবীন্দ্রনাথের "মঙ্গল" নামধেয় কাব্য নিশ্চয়ই মনসা মঙ্গল ছিল না; ছিল ব্যঙ্গেরই স্বপ্ন মঙ্গল।

এত কথা বললাম, এই কারণেই, যে কাব্যের, কন্‌টেন্‌ট্ বদলের সংগে সংগেই তার কর্মও বদলেছে। নোতুন 'বিষয়'-এর জন্যে দরকার হয়েছে নোতুন "পাত্রের"।

আধুনিক কাব্যকে তাই পাত্রস্থ করার জন্যেই ডাক পড়েছে, পদ্যের খান-খড়ম বাতিল করে, গদ্যের আচকান গায়ে চড়িয়ে উপন্যাসের, ছোট গল্পের!

কিন্তু না, এতেও এখন কুলোচ্ছে না। কালটা দ্রুত গতিতে চলেছে, একেবারে এসকেপ ভেলোসিটিতে। অতীতের মাধ্যাকর্ষকে সে এখন কেবল পেরোতে চাইছে না, পেরিয়েও গেছে।

তাই আধুনিক সাহিত্যের রূপের বদলটা ঘটবে তো অনিবার্য ভাবেই! বলা ভুল হল, "ঘটবে" নয়, এরই মধ্যে ঘটে গেছে। কিন্তু কি নাম এই অভিনব অত্যাধুনিক সাহিত্য রূপের? আমাদের সাহিত্যের নবজাতক কিছুকাল আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখনও তার নামকরণ করা হয়নি—তবু একটা নাম দেওয়া যাক একে!—ছো-বি-তা!

কিন্তু কেন এই নাম?—উনিশ শতকের শেষের দিকে এ দেশে জন্ম নিয়েছিল ছোটগল্প। প্রথম ছোটগল্প লিখেছিলেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই। ১২৮০ (১৮৭৩) বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শনে, "শ্রী পু'চ" "মধুমতী" ছাপা হয়। লেখক ভেবেছিলেন তিনি বুঝিবা উপন্যাসই লিখেছেন। কিন্তু না! তাঁর কাল, তাঁকে দিয়ে এক "অভিনব ভঙ্গী" রচিয়ে নিয়েছিল!

অনেক পরে যার নাম দেওয়া হয়, "ছোটগল্প"। যার সর্বোত্তম রূপ পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া কাহিনীতে।

এটা তো হল এক দিককার খবর। অন্যদিকে নোতুন যুগের গীতি কাব্যের খবর এসে পৌঁছেছিল বিহারীলালের সারদা মঙ্গলের লেফাফাতেই। মঙ্গল কাব্যের আঙ্গরাখা পরালে কি হয়, উনিশ শতকের উপনিবেশিকতা, রোচিষ্ণু-গীতির দ্বৈপায়ণতা সৃজন করিয়ে নিয়েছিল তাঁকে দিয়ে।

এ ক্ষেত্রেও অতুলনীয় নির্মিতি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথেই। তাঁর প্রতিভার রেখা ধরেই আমাদের গীতি কবিতা বিশ্ব সাহিত্যের শিখরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

তাই প্রথম মহাযুদ্ধের কালটায় তিনি যখন "লিপিকা" রচনা করলেন—তা দেখে অনেকেই তখন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন—কারণ লিপিকার রচনাগুলোকে, গীতি কবিতা বলতে বাধছিল, আবার তাকে ছোটগল্প বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবে? সেগুলি কি ছিল আসলে?—"গল্পিতা"? "কাব্যল্প"?

না, এ নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করেন নি। তবে গীতি কবিতাকে যখন তিনি অন্ত্যানুপ্রাস আর ছন্দের বন্ধন হতে

মুক্তি দিয়েছিলেন, তখন সেই পদ্ধতিকে, যাঁরা অনুসরণ করতেন, তাঁরা তাকে "গবিতা" (গদ্যকবিতা) বলেই উল্লেখ করতেন।

তাঁদের সেই নামকরণটা কিন্তু সময়ের ধোপে টেঁকেনি। কারণ গদ্য কবিতা কেবল গদ্যে লেখা কবিতা নয়,—অন্য কিছু। অত্যাধুনিক বাংলা কাব্যের একেবারে নোতুন ফসল।

সকলের অজান্তেই, ছোট গল্প আর গীতি কবিতা, উনিশ শতকী সৃষ্টির ঐ দুই অঙ্গ ক্রমশ কাছাকাছি আসতে আসতে একেবারে এক হয়ে গিয়েছিল। তাদের দু য়ের রূপটা গিয়েছিল তাই বদলে, গুণটাও অপরিবর্তিত ছিল না।

আর এই রূপ-গুণ বিন্যাসকে, কিছুতেই পুরানো নামের বাক্সবন্দীতে রাখা সম্ভব নয় বলেই, অভিধা আর ধারণায় এখন লড়াই বেধে গেছে। এ দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটতে পারে, নোতুনের নামকরণে,-পুরানোকে যদি বাতিল করা যায়।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি:—

আজকের দিনের কবিতা, আর সেকেলে ঢংয়ের ছড়ার পোষাকে নেই। এমন কি আধুনিক ছোটগল্পও, তার গত-শতকের শতকিয়া আউড়াতে চায় না। সেই সৃজনশীল শিল্পের ঐ দু-পক্ষ এখন মিলে গেছে এক রসায়নিক যৌগিকে। যার নাম ছোবিতা।

এই ছোবিতারই দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আজকের আলোচনার সমাপ্তি টানবো। একটি লেখা হয়েছিল আজ থেকে ছ'দশক আগে। লেখক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

আর দ্বিতীয়টি লিখেছেন একেবারে এক অখ্যাত লেখক; ততোধিক অখ্যাত অসাময়িক এক অসহুরে পত্রিকায়। ছোবিতা দুটি এবার লিখে শোনাই:

(১) প্রথম শোক ॥

বনের ছায়াতে, যে পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে,—হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠল, "আমাকে চিনতে পার না?" আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম।

—বললেম, "মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছিনে।"

সে বললে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ?"

কোন কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলি ফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

এবার, (২) সুখ ॥

ছেলেটা প্রায়ই নাটকের মহড়ার এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারত। ঝিয়ের ছেলে। নাম তার সুখ। ঘুর ঘুর করত জানালার এপাশে ওপাশে। ঘরে ঢুকত না।

হঠাৎ সেদিন ডাক পড়ল সুখ এর একেবারে ঘরের মাঝখানে।

নাটকে ভিখিরীর জামার দরকার। ওর গায়ের ছেঁড়া জামাটা কেড়ে নেওয়া হল।

খালি গায়ে, শীতের রাতে, সুখ ছেলেটা হি হি করে কাঁপতে থাকে।

তার জামা পরে, নকল ভিখিরী, মঞ্চে উঠে আসর মাৎ করে দিল।

হাত তালিতে ফেটে পড়ল গোটা চত্বর।

দাঁতে দাঁত লেগে, সুখ তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে।

অসম্পাদকীয় মন্তব্য :—

কেবলমাত্র পঙ্ক্তি বিন্যাসে অদল বদল ঘটিয়েই এ ছোবিতা দুটিকে ছোটগল্প আর কবিতায় কি রূপ দেওয়া যায় না? গল্প কবিতা এক হয়ে গিয়েছে কিনা তাই! গুণীজন কি বলেন?

চিন্তা

হরপ্রসাদ মিত্র

এক

আসলে কী যে ঘটছে সে তো কিছু-না-কিছু
জানে সবাই।
জীবন ক্রমে মরুবালির মতনই হয় শুক্‌নো।
সে তো সবারই ব্যক্তিগত ব্যাপার—
ঘটে সব যুগেই।
কিন্তু এই অধুনাতন অসুখ খুবই ছড়ানো-
জানেনা কেউই নিরাময়ের কী হতে পারে রাস্তা।
অন্তহীন দিন-রাতের লড়াই লোকে লড়ছে
পাখির মতো উড়তে গিয়ে বুলেট খেয়ে পড়ছে।

দুই

বেশ জোরে কেউ মাড়ালেন, কেউ তাড়ালেন।
কাম ক্রোধ লোভ—রিপুদের ক্ষোভ
দম্‌কা হাওয়ায় ওড়ালেন।

পিষ্ট হওয়া বা পূর্ণ হওয়া বা
শূন্যে মেলানো ভাবটা
প্রাণ থেকে মনে মন থেকে ক্রমে
উবে যায়, আহা উবে যায়,
যেটা পড়ে থাকে—
সে তো প্রাণহীন খাপটা।

তিন

জানলায় উড়ন্ত দৃশ্য—
আমি এক মেল ট্রেনে আছি।
কী জানি কোথায় যাচ্ছি—
অনেকেই এই ভাবে বাঁচি।

চার

সবটাই দেয়াল যেন—
পালাবার রাস্তা কোন্ দিকে?
প্রশ্ন করি নিজে নিজে
ঘুমটা হঠাৎ হয় ফিকে।

জেগে উঠে বিছানায়
অন্ধকারে দেয়ালটা খুঁজি।
দেয়ালের চিহ্ন নেই,
চৈতন্যের এ কী গলিঘুঁজি!

জানুয়ারি ১৯৮২

বাংলার মন্দিরে রামায়ণ কাহিনী

তারাপদ সাঁতরা

বাংলার মন্দিরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সৃষ্টিতে একদা বাঙ্গালী সূত্রধর-শিল্পীরা যে সৌন্দর্য-সুষমার অবদান রেখে গেছেন, তা' আজ বঙ্গ সংস্কৃতির এক মহামূল্যবান সম্পদ। বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে মন্দির সজ্জায় যে প্রথাগত পোড়া-মাটির ভাস্কর্য সৃষ্টি করা হত, তা' বাঙ্গালী শিল্পীর একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। আলোচ্য পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দিয়ে সাধারণতঃ মন্দিরের সম্মুখ ভাগে অলংকরণের এই পদ্ধতি পশ্চিমবাংলার বহু মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায়। এইসব ফলকগুলি প্রস্তুতের জন্যে শিল্পীরা আধ-শুকনো মাটির ফলকের উপরে স্বল্পগভীরে এইসব মূর্তিগুলি খোদাই করতেন; তারপর তা' ভাল ভাবে শুকিয়ে নিয়ে ভাঁটিতে পোড়াবার ব্যবস্থা করতেন। পোড়ানোর পর ফলকগুলিকে মন্দিরসজ্জায় সাধারণতঃ সামনের দেওয়ালের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই ব্যবহার করতেন। ফলে এই পোড়ামাটির অলংকরণ এক সার্থক সৌকুমার্যের সৃষ্টি করতে।—যা একান্তই মুগ্ধ হয়ে দেখার মত।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত নির্মিত এইসব পোড়ামাটির মন্দিরে যে সব অলংকরণ দেখা যায় তার বিষয়বস্তু হল রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশ্যের সঙ্গে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী এবং কৃষ্ণলীলার আখ্যান বস্তু। এই সঙ্গে দেখা যায় বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর উপাখ্যান, দশাবতার সহ অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি। এ ছাড়া, তৎকালীন সমাজ জীবনের, বহু কাহিনীর রূপায়ণও দেখা যায় এইসব মন্দিরসজ্জায়। মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির অলংকরণের বিষয় বস্তুর মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় হল, যে কোন ভক্তিভাবেরই মন্দির হোক না কেন এইসব মন্দিরসজ্জায় বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব সব রকম ভক্তিভাবই

ভাস্কর্যে রূপায়িত করেছেন বাংলার মন্দির শিল্প-স্থপতিরা। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব মন্দিরে যেমন কৃষ্ণলীলার উপাখ্যান স্থান পেয়েছে তেমনি তারই সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে শাক্ত বা শৈব উপাসনার নানাবিধ কাহিনী। অন্যদিকে শাক্ত বা শৈব মন্দিরেও যে কৃষ্ণলীলার ভাস্কর্য স্থান পায়নি এমন নয়! তাই বলা যেতে পারে, বাংলার এইসব মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির ভাস্কর্য-অলংকরণে শুধু শিল্পীর কারিগরী নৈপুণ্যেরই পরিচয় প্রকাশ পায়নি, সেই সঙ্গে মন্দিরসজ্জায় এইসব শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতাও তার এই সৃষ্টিমূলক কাজে সহায়তা করেছে, যা ভক্তিজগতে পরম সহিষ্ণুতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়েছে।

মন্দির দেবালয়ে পৌরাণিক কাহিনীর উপাখ্যানযুক্ত ভাস্কর্য-ফলকের এই যে ব্যবহার তা' বহুদিন ধরেই এক প্রথাগত বিধি-নিয়ম হিসাবেই প্রচলিত হয়ে আসছে এবং এ বিষয়ে বঙ্গদেশ ছাড়াও অন্যত্র বহু মন্দিরে তার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বৌদ্ধ স্তূপগুলিতে জাতক কাহিনীর ধারাবাহিক চিত্রণ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই প্রচলিত ধারাটির কথা। এই উদাহরণ সামনে রেখেই হিন্দু-স্থপতিরাও মন্দির দেওয়ালে সেকালের জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণের ঘটনাবলীও খোদাই করেছেন। এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল, উত্তর প্রদেশের গুপ্তযুগের দেওগড়ের মন্দিরগাত্রে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের আইহোলের পট, দকলের এবং ইলোরায় দ্বাদশ শতকের হোয়সল মন্দিরে রামায়ণ কাহিনীর চিত্রায়ণ। পূর্ব-বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) পাহাড়পুরের খ্রীষ্টীয় নবম শতকের বৌদ্ধ মন্দিরেও দেখা যাচ্ছে রামায়ণ কাহিনীর বেশ কিছু ভাস্কর্য-ফলক।

তবে পোড়ামাটির সজ্জায় রামায়ণ কাহিনী যেভাবে বাংলার মন্দিরগাত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এমন জাজ্বল্যমান উদাহরণ আর কোথাও নেই। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতক থেকে সুরু করে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে নির্মিত এমন কোন টেরাকোটা-মন্দির নেই যেখানে রামায়ণ কাহিনীর চিত্ররূপ

দেখা যায় না। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলার মন্দিরে মহাভারত কাহিনীর চিত্রায়ণ অতি অল্পই হয়েছে এবং সংখ্যায় তা' খুবই নগণ্য। মাহাভারত কাহিনীর মধ্যে এ-যাবৎ দেখা গেছে শুধুমাত্র ভীষ্মের শরশয্যা অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি ভাস্কর্য-ফলক।

অন্যদিকে বাংলার মাটিতে কবি কৃত্তিবাসের অমর সৃষ্টি রামায়ণ কাহিনী শুধু বাঙ্গালী জীবনকেই প্রভাবিত করেনি, বাংলার মন্দির শিল্পীদের কাছেও তার জনপ্রিয়তা যে একাত্ম-ভাবেই স্বীকৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ মন্দির দেওয়ালে কেবলমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাহিনীরই অলংকরণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ একদিকে যেমন বাঙ্গালী মনে প্রভাব বিস্তার করেছে, অন্যদিকে চৈতন্য প্রবর্তিত নব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্লাবনে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। কবি কৃত্তিবাস সেজন্যে লিখেছিলেন,

'বিষ্ণু অবতার রাম, তুমি নিশাচর।
গরুড় বায়স দেখ অনেক অন্তর॥'

সুতরাং বলা যেতে পারে, বাঙ্গালী জীবন কোনদিন বিষ্ণু ও কৃষ্ণে বা রাম ও বিষ্ণুতে কোন প্রভেদ দেখতে পাননি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলার মন্দির দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রামায়ণ ফলকগুলির বিষয়বস্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণকে কেন্দ্র করে, তবে সব মন্দিরেই পুরো রামায়ণ কাহিনী দেখা যায় না। কতকগুলি জনপ্রিয় সাধারণ বিষয়বস্তু ছাড়া রামায়ণের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী ভিন্নি ভিন্ন মন্দিরে রূপায়িত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত মন্দিরে হয়েছে। পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত মন্দিরে রামায়ণ কাহিনীর এই যে বিভিন্ন চিত্ররূপ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে তা যদি একত্র করা যায়, তাহলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীরই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রামায়ণ কাহিনীর ভাস্কর্য-ফলকের বিষয়বস্তু সম্বলিত এক তালিকা এই প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করা গেল। তবে এইসব ফলকগুলির পরিচিতি লাভ

করার জন্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরই মুখ্যতঃ নির্ভর করতে হয়েছে। কেননা কবি কৃত্তিবাসও এই প্রসঙ্গে তাঁর কৈফিয়ৎ দিয়ে বলেছেন :

"নাহিক এসব কথা বাল্মীকি বচন।
বিস্তারিয়া লিখিত অমৃত রামায়ণে॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার॥"

তাই বাঙ্গালীর আপন জীবনের মাধুর্য দিয়ে রচিত কৃত্তিবাসের কাহিনীই বাঙ্গালীর মনে-প্রাণে এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, বাংলার শিল্পী ভাস্কররাও কৃত্তিবাসের বচন ছাড়া পৃথক কিছু চিন্তা করতেও সক্ষম হয়নি এবং এইখানেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচনা সৃষ্টিরও এক চরম সার্থকতা।

পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রামায়ণ কাহিনীর বিবরণ :

(১) রাজা দশরথের রাণীদের পুত্রলাভের জন্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির হোম যজ্ঞ। দ্রষ্টব্যঃ হুগলীর গুপ্তিপাড়া ও বাঁশবেড়িয়ার মন্দির।

(২) দশরথের রাণীদের পুত্রসন্তান লাভ এবং তৎসহ সন্তান পরিচর্যারত পোড়ামাটির ফলক। দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব ও ভট্টমাটির মন্দির।

(৩) মুনিদের যজ্ঞ ভঙ্গকারী দৈত্য বধে নিযুক্ত রাম ও লক্ষণ। দ্রষ্টব্য : হুগলীর বাঁশবেড়িয়ার মন্দির।

(৪) তাড়কাসুর বধে রাম লক্ষণকে প্রেরণের জন্যে বিশ্বামিত্র কর্তৃক দশরথকে অনুরোধ। দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব ও সেখানকার জোড়বাংলা মন্দির।

(৫) রাম-লক্ষণ কর্তৃক তাড়কারাক্ষসী বধ। তুলনীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

'বজ্রবাণ গড়ে রাম ব্রজের গড়ুকে।
নির্ঘাত করিল বাণ তাড়কার বুকে॥'

দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের জোড়বাংলা মন্দির এবং মেদিনীপুরের আজুরিয়া গ্রামের মন্দির।

(৬) রাম কর্তৃক অহল্যার শাপমোচন। দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের মন্দির।

(৭) মিথিলাতে ছয়-সাত জন লোক কর্তৃক আনীত হরধনু-ভঙ্গরত রাম এবং সেইসঙ্গে সীতার সঙ্গে রামের ও অন্যান্য তিনটি বিবাহ অনুষ্ঠানের দৃশ্য। দ্রষ্টব্য : হুগলীর গুপ্তিপাড়া ও বাঁশবেড়িয়া এবং মুর্শিদাবাদের বড়নগরের জোড়বাংলা মন্দির।

(৮) পথিমধ্যে পরশুরাম কর্তৃক পুণর্বার ধনুর্ভঙ্গের জন্য আহ্বান। দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির।

(৯) মন্থরা কর্তৃক কৈকেয়ীকে মন্ত্রণাদান। দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির।

(১০) রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানোয় দশরথ শয্যাগত। দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির।

(১১) বিদায়ক্ষণে ভরত ও রাম আলিঙ্গনাবদ্ধ। দ্রষ্টব্য : বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির।

(১২) পঞ্চবটি বনে রাম লক্ষ্মণ কর্তৃক কুঁড়েঘর নির্মাণ। দ্রষ্টব্য : বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির।

(১৩) লক্ষ্মণ কর্তৃক সুর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন। তুলনীয় কৃত্তিবাস :

"খান্দা নাকে রক্ত পড়ে অবিরল স্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে॥"

দ্রষ্টব্য : হুগলীর গুপ্তিপাড়া, মুর্শিদাবাদের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির এবং মেদিনীপুরের আজুড়িয়া, পূর্বগোপালপুর, গৌরা ও সৌলান গ্রামের মন্দির। বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামের একটি আটচালা মন্দির দেওয়ালে যে উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য ফলকটি বিদ্যমান—তা ফুল-পাথরে নির্মিত।

(১৪) রাম কর্তৃক মারীচ বধ। দ্রষ্টব্য : হাওড়া জেলার সুলতানপুর ও মেল্লক এবং মেদিনীপুর জেলার গৌরা গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির।

(১৫) ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে রাবণের পঞ্চবটি বনে আগমন। দ্রষ্টব্য : হুগলীর দশঘরার মন্দির।

(১৬) রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ। দ্রষ্টব্য : হাওড়া জেলার মহিষামুড়ি ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির।

(১৭) জটায়ুর 'রথশুদ্ধ গিলিবারে দুই ঠোঁট মেলে বাধা' দেবার দৃশ্য। দ্রষ্টব্য : বীরভূমের কেঁদুলীর রাধাবিনোদ মন্দির, মেদিনীপুরের দাসপুর, গৌরা, সৌলান ও ঐ জেলার আরও অনেক মন্দির।

(১৮) সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের জল্পনা কল্পনা। দ্রষ্টব্য : হাওড়ার মহিষামুড়ি ও হুগলীর দশঘরার মন্দির।

(১৯) সপ্তবৃক্ষের আড়াল থেকে রাম কর্তৃক বালী বধের জন্য তীর নিক্ষেপ। কৃত্তিবাসের কথায় :

'আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপন।'

দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের গঙ্গেশ্বর শিব মন্দির।

(২০) বালীর উক্তি মত, 'রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে লেজে বান্ধি ডুবালাম চারি পারাবারে'-র দৃশ্য। দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের জোড়বাংলা মন্দির।

(২১) রাবণ দরবারে পাত্রমিত্রদের নির্দেশদানরত ; সম্ভবতঃ বিভীষণকে ভৎর্সনার দৃশ্য। দ্রষ্টব্য : বীরভূমের সুরুলের লক্ষ্মী-জনার্দন ও হুগলীর হরিপালের মন্দির।

(২২) হনুমানের লঙ্কা অভিমুখে সমুদ্রপারে লম্ফের দৃশ্য এবং সুরাসা সাপিনী কর্তৃক বাধা দানের দৃশ্য। দ্রষ্টব্য : হুগলীর গুপ্তিপাড়ার মন্দির।

(২৩) লঙ্কায় রাবণের রাক্ষসদের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ। কৃত্তিবাসের বর্ণনার সঙ্গে এই দৃশ্যটি তুলনীয় ; যথা :

'ধেয়ে যায় রাক্ষস বধিতে হনুমান।
প্রাচীরে বসিল বীর পর্বত প্রমাণ॥
জাঠা শেল ঝকড়া মুষল ফেলে কোপে
লাখে লাখে হনুমান সব অস্ত্র লোপে॥'

দ্রষ্টব্য : বীরভূমের সুরুলের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির।

(২৪) হনুমানকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রাক্ষসরা বাঁকে করে গমনরত। কৃত্তিবাসের কথায় :

'বড় বড় সাঙ্গি দিয়া হনুমানে বান্ধে।
দুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে॥'

দ্রষ্টব্য : হাওড়ার মহিষামুড়ির এবং বীরভূমের জয়দেব-কেঁদুলীর মন্দির।

(২৫) হনুমানের লঙ্কাদাহনের দৃশ্য। তুলনীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

'ধরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান॥
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্বাণ তার কেবা কারে বলে॥'

দ্রষ্টব্য : হুগলীর গুপ্তিপাড়া ও হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মন্দির।

(২৬) সমুদ্রে সেতুনির্মাণের জন্য পাথর ও গাছের ডালপালা আনয়নরত বানর সেনাগণ। দ্রষ্টব্য : বীরভূমের কেঁদুলীর রাধাবিনোদ মন্দির এবং হুগলীর গুপ্তিপাড়া ও দশঘরার মন্দির।

(২৭) অশোক বনে চেড়ী পরিবৃতা সীতার অধিষ্ঠান, পাশে রাবণ। দ্রষ্টব্য : হুগলীর গুপ্তিপাড়ার ও মেদিনীপুরের গৌরা গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির।

(২৮) অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎকার এবং হনুমান কর্তৃক রামের অঙ্গুরী প্রদান। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সাক্ষাৎকারের বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে, যথা :

'সীতা হনুমান দোহে হইল দর্শন॥
যোড়হস্তে সমে তারে পবন নন্দন।
জানকী বলেন বিধি বিগুন আমায়॥
রাবণের চর বলি না করিহ ভয়।
স্বরূপ রামের দূত জানিহ নিশ্চয়॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয়॥'

দ্রষ্টব্য : হুগলীর দশঘরার মন্দির।

(২৯) কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য তার পিঠের উপর হস্তী স্থাপন। এই দৃশ্যটি বহু মন্দির ফলকেই উৎকীর্ণ হয়েছে। বিশেষভাবে হুগলীর বালী-দেওয়ানগঞ্জের মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির ও মেদিনীপুরের দাসপুর ও সুরথপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির এই

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(৩০) বানর ভক্ষণরত কুম্ভকর্ণ কৃত্তিবাসের বর্ণনার এক যথার্থ রূপায়ণ :

'কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
দুইহাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর॥
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাঁতে।
মুখ সম্বরিতে নারে রক্ত পড়ে স্রোতে॥
সহস্র সহস্র বানর সাপাটিয়া ধরে।
পাতাল সমান মুখ তাহে লয়ে পুরে॥
নাক কানের পথ যেন ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া কপি সব বেরয়ে অপার॥'

দ্রষ্টব্য : হুগলীর গুপ্তিপাড়ার মন্দির। এছাড়া বহু মন্দিরেই এই দৃশ্যটি দেখা যায়।

(৩১) ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ। দ্রষ্টব্য : হুগলীর গুপ্তিপাড়ার মন্দির।

(৩২) আহত অবস্থায় রামের কোলে শায়িত লক্ষ্মণ এবং তার পাকস্থলী থেকে তীর নিষ্কাশনরত হনুমান। দ্রষ্টব্য : হুগলীর বালী-দেওয়ানগঞ্জের মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির।

(৩৩) লঙ্কা যুদ্ধের দৃশ্য। একদিকে ধনুর্বাণধারী রাম ও লক্ষ্মণ এবং তার পক্ষে হনুমান, জাম্বুবান ও ভল্লুক বহিনী। অপর দিকে রাক্ষস পরিবৃত দশবাহু সম্বলিত ধনুর্বাণধারী রাবণ। মূলতঃ লঙ্কা যুদ্ধের এ দৃশ্যটি বহু মন্দিরেই আবশ্যিক অলংকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে হুগলীর আঁটপুর ও মেদিনীপুরের চাঁইপাটের মন্দিরে যে বিস্তারিত লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে তা সর্বোৎকৃষ্ট বলা যেতে পারে।

(৩৪) লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যে একদিকে রাম অন্যদিকে জোড়হস্তে রাবণ। কৃত্তিবাসী ভাষ্যের সার্থক রূপায়ণ : 'চিরদিন প্রণমি দাস চরণে তোমার। শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার॥'
দ্রষ্টব্য : মুর্শিদাবাদের বড়নগরের চারবাংলা মন্দির।

(৩৫) সীতার অগ্নিপরীক্ষা—পাশে ব্রহ্মা দণ্ডায়মান। দ্রষ্টব্য : হাওড়া জেলার রাউতাড়ার দামোদর মন্দির।

রজনীগন্ধা

তৃপ্তি রায়

ঘন অন্ধকারে,—

চুপ করে ছাদের আলসের এক কোণে সুবিনয় দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কোমল করস্পর্শে চমকে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট হাসি!

—"খুব চমকে গেছো না? কাজের বাড়ীর মধ্যে, কত কৌশল করে যে এখানে আসতে হয়েছে!···আমি আবার ভাবছিলাম, তুমি হয়ত আসতেই পারবেনা! যা ভীতু কথা কইছনা যে? সেদিন তোমার কথা রাখিনি বলে, রাগ হয়েছে? আচ্ছা বেশ আজ শোধ করে দিচ্ছি।"—সুবিনয়, কপোলে একটি মৃদু চুম্বনের স্পর্শ অনুভব করে।

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই সিঁড়িতে শোনা যায় পদশব্দ। অপরিচিতা, ত্রস্তে বলে ওঠে,—'হিমুদা আমি চললাম, আজ আর দেখা সাক্ষাৎ হবেনা। বিয়ে বাড়ীর ভিড়ে সকলের চোখ এড়িয়ে তোমার সংগে যে দেখা করতে পারব, তা ভাবিনি। তুমি ত একটাও কথা বল্‌লে না!'—বলেই দ্রুতপদে সে নেমে চলে গেল।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় সুবিনয় স্তব্ধ। সমস্ত ব্যাপারটার কিছুই তার বোধগম্য নয়। শুধু অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব এক অনুভূতি। তার ছত্রিশ বছর বয়সে, এই প্রথম নারী স্পর্শের সৌরভ প্রাপ্তি! তার দেহমনে এক কস্তুরী গন্ধের ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল!—কিন্তু কে সে? কে এই রহস্যময়ী,—যে এই আঁধার রাতে, উন্মুক্ত ছাদে, অকস্মাৎ দিয়ে গেল-পূজার অর্ঘ্য। যে দিয়েছে, সে যে ভুল করেই দিয়েছে, তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই এই তরুণী তার দয়িতের সংগে এখানে গোপনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল; এবং তাড়াতাড়িতে অন্ধকারে ভুল করে কার প্রাপ্য কাকে দিয়ে গেল!

সারারাত ঘুম নেই সুবিনয়ের চোখে। হাতের ওপর একটি কোমল হাতের ছোঁয়া আর কপোলের ওপর নিবিড় এক স্পর্শের স্বাদ অনুভব করলে সুবিনয় অতন্দ্র নয়নে সারারাত ধরে।

"আচ্ছা সে নিশ্চয়ই অপূর্ব সুন্দরী! কারণ তার কণ্ঠস্বর ঠিক সঙ্গীতের মতই অনবদ্য।"

সকালে উঠতেই সুবিনয়ের দিদি বললেন,—"হ্যাঁরে বিনু রাতে তোর ঘুম হয়নি? মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে।" আজও কাজের বাড়ীতে ঘুম বা বিশ্রাম কিছুই হবেনা। আবার কাল ভোরেই চলে যেতে হবে।—"কী চাকরীই নিয়েছিস, বাপু।"

সত্যি; সুবিনয়ের চাকরীতে ছুটি খুব কম। সেনা বিভাগে কাজ করে সে। ছোটবেলা থেকেই এই ধরণের কাজে তার প্রবল আকর্ষণ। মিলিটারীর কাজ। আজ এখান, কাল ওখান করে বেড়ায়। জীবনে তার অবকাশ খুব কম! অবকাশ ভালও লাগেনা সুবিনয়ের। বিয়ে করেনি, বিয়ে করার ইচ্ছাও জাগেনি কোন দিন। তাছাড়া নিজের মা এবং দিদি ছাড়া অন্য কোনও নারীর সংগে মেলামেশা করার সুযোগও তার হয়নি কখনও। দিদির একমাত্র মেয়ে মঞ্জুর বিয়েতে সে দু'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। দিদির একান্ত অনুরোধ এড়াতে পারেনি। আগের দিন বিকেলের গাড়ীতে এসে পৌঁছেছে। গতকাল রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল বিয়ে বাড়িতে এইসব হৈ চৈ-এর মধ্যে সে কী করবে।

এমন সময় কোথা থেকে কী ঘটে গেল।

মধুপ গুঞ্জনের মত সুবিনয়ের মনটা সারাদিন গুনগুন করতে লাগল। দুপুরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় সুবিনয় খবরের কাগজ পড়ছিল কিন্তু তার মন কাগজে ছিলনা, চোখও নয়।

বারান্দা দিয়ে নানারকম চেহারার বিভিন্ন বয়সী মেয়েরা আনাগোনা করছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুবিনয় তাদের সকলকেই লক্ষ্য করছিল। কে,-এর মধ্যে কাল রাতে সোনার কাঠি দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে? ঐ মেয়েটি বোধহয়!—দেখতে সুন্দর,

নিশ্চয়ই সে। না না—তার ঠোঁট অত পুরু হবেনা, বিশ্রী। তার পাশের মেয়েটি ত কথনোই নয়। সে কী অত মোটা হতে পারে?

আচ্ছা একদম ডানধারের মেয়েটি হতে পারে! চমৎকার চেহারা। উঁ হুঁ, কথা বলা শুনেই বোঝা গেল, সে নয়—কী ফ্যাঁস ফেঁসে গলার আওয়াজ! আচ্ছা সবশেষের মেয়েটি?··· না, তার সব ভাল হলেও চোখটা একদম ভাল নয়। কী কুৎকুতে চোখ।—তবে?·····

সারাদিন ধরে তাকে খুঁজে হতাশ হয়ে গেল সুবিনয়। যার কণ্ঠ আর স্পর্শ তাকে উতলা করে দিয়েছে তার সন্ধান মিললনা কিছুতেই।

রাতে সব কাজ মিটে গেলে সুবিনয় চুপ করে পুকুরধারে বসে ছিল।

মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত অসীম আকাশ, সামনে পুকুরের নিস্তব্ধ কালো জল, বাতাসে ভেসে আসা হাস্নুহানার গন্ধ আর সানাই-এর রাগিনী এর সঙ্গে মিলে গেল—গতরাতের ক্ষণিক স্পর্শের এক উষ্ণ আবেগ এবং না দেখা একখানি মুখের কোমল মাধুর্য।

সুবিনয়ের মনে হল সমস্ত পৃথিবী এক অনির্বচনীয় রহস্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

(চেকভের Kiss-গল্পের অনুসরণে)

ক্ষণিকের স্মৃতি

রতন কুমার দাস

বাসটা এসে জি. টি. রোড ও হুগলী স্টেশন রোডের সংযোগস্থলে থামলো। দুজন যাত্রী বাস থেকে নামলো। একজন নতুন যাত্রী উঠলো। মাথায় তার বিরাট একটা বোঁচ্‌কা। বাসের এক কোণ থেকে একজন বললো—'মশাই, আপনার বুদ্ধি কি একদম লোপ পেয়েছে?' তার কথা শেষ হতে না হতেই আর একজন বলে উঠলো—"একদম দাঁড়ানোর জায়গা নেই তারও পরে একটা বিরাট বোঁচ্‌কা নিয়ে উঠেছেন, এটা কি মালগাড়ী পেয়েছেন নাকি?" ভিতর থেকে একজন বললো—"নামিয়ে দিন না বাস থেকে।" আর একজন—"ওর বোঁচ্‌কাটা বাইরে ফেলে দিন।"

চার পাঁচজন যাত্রী মিলে তখন তাকে নামিয়ে দেয় আর কি! এমন সময় একজন বুড়ো ভদ্রলোক বললেন—"থাক, উঠেছেন যখন যেতে দিন।" বুড়ো ভদ্রলোকের কথায় আস্তে আস্তে বাসের গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হলো। ভদ্রলোকটি এক সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বোঁচ্‌কার মধ্যে কি আছে?" এতক্ষণ পরে লোকটি কথা বলার সুযোগ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—'এর মধ্যে কিছু বই আছে। একটা বইয়ের দোকান আছে আমার। বিক্রি করবো বলে নিয়ে যাচ্ছি।'

যাত্রীদের মধ্যে তখন বেশ একটা বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করা গেল। একজন যাত্রী কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞেস করলেন- 'কী বই আছে?'

লোকটি বললো-'গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধের নানা রকম বই। অনেকগুলো দুষ্প্রাপ্য বইও আছে।,

এক ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললেন— আপত্তি না থাকলে 'আপনার বোঁচ্‌কাটা একটু খুলুন না দয়া করে।'

লোকটি বললো—'না, আপত্তি কি।'

অনেকে মিলে বোঁচকাটা খোলার জন্যে তাকে জায়গা করে দিল তখন। লোকটি বোঁচ্‌কাটা খুললে তা দেখতে বেশ ক'জন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। হাতে হাতে বই তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো।

বইগুলোর মধ্যে ৯৯ বছরের পুরোনো একটা বাংলা সাময়িক পত্রিকা ছিল। যে ভদ্রলোকটি একটু আগে বোঁচ্‌কাটা বাইরে ফেলে দেবার জন্যে চেঁচিয়ে ছিলেন তিনিই সেই পত্রিকাটি তুলে নিয়ে দাম জিজ্ঞেস করলেন।

বইওয়ালা ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখলো। মৃদু হেসে বললো—'দাম বেশী নয়, কিন্তু ওটা কী আপনার কোন প্রয়োজনে লাগবে?'

ভদ্রলোক অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন,-ওটা আমার ভীষণ প্রয়োজন। এ বইটা আমায় দিন, যা দাম চাইবেন দেবো।

বইওয়ালা আবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হাসলো একবার। বললো,—'আচ্ছা নিন!'

ভদ্রলোক বইটি পেয়ে খুব খুশী হলেন।

যাত্রীদের মধ্যে আরো ২।১ জন তাদের পছন্দ মত ২।১ টা বই কিনলেন।

লোকটির নামবার জায়গা এসে গেলে দেখা গেলো অনেকে মিলেই তার বোঁচ্‌কাটা ধরে সাহায্য করলেন তাকে নেমে যেতে।

'সৈকত'-এর নাম পরিবর্তন—
এখন থেকে 'সাহিত্য সৈকত'

সংস্কার

কাকলি ভট্টাচার্য

সন্ধ্যা হি আইস্‌সে গণেশ গাঁকে যাইথাইলা, কাপড়ের গাঁট্‌রি পিঠরে লিকি আগড় ঠেলিকি ঢুকলা। ঘর অন্ধকার। দুয়ারে খাড়াহিকি ডাকলা—'মা-আ-আ, কাইচুরে'?

ঘর ভিতনু গণেশের মা সাড়া দিলা—'কাইরে বায়া আমি ঘরে শুইচি'। গণেশ দুয়ারে কাপড় পেকিদিকি আস্তে আস্তে ঘরে যাইকি ঢুকলা। সে ঘরে গটে বিলিকি ঝুরকা নাই সেজিন্যে দিশিয়াবেলাবি ঘরটা অন্ধকার হিরয়। গণেশ তার মাকে পচরিলা।

—'শলি কুন্ঠি রাখচু? অতক্ষণ আলো জ্বালুনি কেনি?

—'কাঁথের গর্তর হাত ঢুকিদে পাবু'।

গনেশ দিয়াশলি পাইকি লম্ফ জ্বালি পেকিলা। তার মার কতরে বুসি পড়িকি কইলা—কি হিচে শুইচু কেনি মা?

গণেশের মা ত কাঁদি পেকিলা—'বাপোরে আমিত দুফরবেলা গাড়িয়া ঘাটকে কাপড় কাচতে যাইথিলি। অঠেন্‌ঠেনিয়া ঘাটরে উল্টিকি পড়িচি। কুনমতে বেড়াটা ধরি ধরি ঘরকে আস্‌সি! ততক্ষনন্নু শুইরইচি ওউঠি। কো-নাই চারুআড়ে কাকে আর কইবা। বায়ারে আমার বোধহয় হাড়গোড় ভাঙিচে।

গণেশ তার মার গান্নু কাঁথাটা সরি দিকি দেখলা গোড়র গঁইঠি ফুলিচে, গাটাবি বেশ গরম লাগেটে।

—তোর গারত জ্বর আসসে কি করবা ক ত অখন। তোকে একলা পেকি দিকি আমি অখন কুনমা যাবা! কইকি দুই হাঁটুর ভিতরে মুটা গুঁজিদিকি বুসি রইলা কতক্ষণ।

গণেশের বয়স সতের-আঠার হবে। সে জাতরে ধোবা। গাঁর একধারে গটে ছোট্ট ঘর করিকি সে আর তার মা রয়। বন্যার সময় তার বাপ আর ভাই-ভনি সব সমুদ্রর বান্‌রে

ভাসি চালিচে। তার মা তাকে কোলে লিকি বালিআড়িকে পালি থাইলা বালিকি বাঁচিচে।

গণেশ আর তার মা অখন্ পাঁচ-ছটা গাঁর কাপড় কাচে। গণেশ মাঝে মাঝে গানু ঘুরিকি মলা কাপড় গাঁটরি করিকি লি আইসে। তার মা বুসি বুসি কাপড় সিজায়, কাচে। সেবি দুফরবেলা ঘরকে ফেরিকি কাচি দেয়। গণেশ টিকে কুঠিয়া মতন আছে। সকালনু উঠিকি বুলতে চালি যায় এমা-সেমা। কুনদিন কো ডাকনে মজুর খাটতে বি যায় লোকের দুয়াকে। সে কুনদিন ইস্কুল যায়নি। নিজের নামটাবি লিখতে পারেনি বলিকি আফশোষ করে বেলে বেলে। মজুর খাটিকি আর কাপড় কাচিকি যা পায় তার মা-পোর চালি যায় কুনমতে।

অনেকক্ষণ পরে গণেশ দুই হাঁটুনু মুটা উঠিকি কইলা

—'মা তোর গোড় খোব বেশি বথা হিচে নাকি'?

তার মা কইলা—'অখন কমচে টিকে। তুই অত ভাবুট্ কেনি? উঠি পড় হাত মু ধুইকি গাঁনু যে ভুজা আন্থুলু সেদিন টিনের ভিতরে আছে দুটা মুর দেত বায়া,।

গনেশ কইলা—'তুমি দুটা লও, আমি দুটা লিটি রাতিয়াবেলা আর রাঁধতে হবেনি।

—তুই খাইলে রাপো আমি আজ আর কিছ খাবানি। কইকি তার মা কাঁথাটা ভালাকি গাকে টানিলিলা।

গণেশ দুমুঠা ভুজা মুরে পেকি দিকি তার মার পাশরে গটে মস্না বিছি দিকি আস্তে আস্তে শুই পড়লা।

কতক্ষণ পরে তার মা ডাকুলা। —কটিয়া, ঘুমিচু নাকিরে?

—না, কি কওট?

—আমি কইটিকি সউ হরিপুরের কনিয়াটাকে ব্যা হি পড়। তার বাপো-ভাই বেশ কথা-বার্তায় ভালা। আমার বেশ ভালা লাগ্চে কানে গটে সুনার গহনাবি দিবে কইচে। হাত্রে আর গলারে রূপার্ দিবে। শুন্ছি সে মাইঝি নাকি বেশ চালাক্ আছে। দেখুট্ আমার অবস্থা আমি আর ক'দিন বাঁচবা ক ত?

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইকি গণেশ কইলা—

—সে মাইঝি নাকি ইস্কুলে পড়থায়। কুন সময় যদি আমাকে নাম-টাম লিখতে কয়। তার চাঁইতে একদম মূর্খ মাইঝি ভালা।

তার মা কইলা—

—না না, সেরকম করবেনি। তুই আর অমত করনি বাপো।

—আচ্ছা সে কথা পরে হবে অখন তুমি ঘুমাও ত দেখি।

সকালে ঘুমন্থ উঠিকি গণেশ গাঁর ভিতকে গেলা পরেশ ডাক্তারের কতকে। সে গাঁরে মোটে ডাক্তার নাই। পরেশ মাইতি কলকাতারে গটে ডাক্তারের কতরে কিছদিন রইকি গাঁরে আসিকি ডাক্তার হিকি বুসিচে। এ ছাড়া উপায় নাই বিলিকি তার কতরে রোগীর ভিড়্বি লাগি রয়। গণেশ ডাক্তারের দুয়াকে যাইকি হাঁক মারলা—

—ডাক্তারবাবু আছ নাকিগো?

—কে-এ?

—কাই আমি গণেশ শীট্।

ডাক্তার বাহারকে আইস্তে গণেশ কইলা।

—'আমার মা গাড়িয়া ঘাট্নু পড়িকি গোড় ফুলিচে। তুমি বেল্লে দুয়াকে দেখতে যাব।

—আরে নাঃ আমার সময় হবেনি অখন। তুই বরং কটা বড়ি লিজা তোর মাকে খুই দিবু, ঠিক হিযাবে।

ডাক্তার তিনটিয়া বড়ি আনিকি গণেশের হাতরে দিলা। কইলা—'সারাদিনে তিন ঘণ্টা অন্তর খুই দিবু তিনটিয়া বড়ি। পরে আসিকি কইবু কিরকম আছে। সাড়ে তিনটাকা দাম হিচে। দে।,

ডাক্তার হাত পাততে গণেশ কাপড়ের খুঁট্নু দুটা মলিয়া টাকা খুলিকি তার হাতরে দিলা। কইলা বাকীটা পরে দিবা। আর কতরে নাই অখন।

গণেশ ঘরে আসিকি দেখলা তার মা বাহারে বুসিকি কাপড় সিজায়টে ! তার মাকে কইলা—

—'তুমার বধা গোড়লিকি উঠি আয়ল কেনি, আমি ত সিজিকি কাচি দিতি। হা লও ওষুধ আনচি। মুটা ধুইকি খাই লও অখন গটে। আর দুটা তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাইলিব। গণেশের মা হাত পাতিকি ওষুধগুলা লিলা, কইলা-'গোড়ের বধা টিকে কমচে অখন।

দুফরবেলা গণেশ রাঁধবে কইতে তার মা তাকে রাঁধতে দিলানি, নিজে রাঁধলা বুসি বুসি। গণেশ জল আনিদিলা, বাটন বাটি দিলা বাসন ধুইদিলা। খাইতে বুসিকি গণেশ মাকে কইলা—উত্তর সাইরে পরধান ঘরে বুড়া মরিচে। তরসুদিন তার শাদ্ধ হবে। আমাকে যাইতে কইচে।

মা অবাক হিকি কইলা—মরি গেলা বুড়াটা ! বোড় ভালা লোক থাইলারে। আমি গাঁকে গেনে ডাকিকি পচ্‌রিথায় কত কথা। আর অখন চোখরে ছানি পড়িচে কুন্‌মা বারিতে প্যারিনি কারু সাঙ্গে দেখাবি হয়নি। সব আগেকার লোক চালিযায়টে বাপো।' টিকে থামিকি আবার কইলা—তার ঘরে কাপড় কাচিদিতে হবেত। আজ-কাল যাইকি লি আইসবু।

পরধান ঘরে শাদ্ধর দিন গণেশ যাবে বলিকি বাহারে নামি পড়চে তার মা পিছনু ডাকিকি কইলা—'বায়ারে তুই খাইকি আইসবার সময় আমার জিন্যে দুটা উখড়া মাঙিকি লিআইস্‌বুত। তার ঘরে বোড়ো বউকে আমার কথা কইবু সে দিবে।

গণেশ কইলা—'আমার মাঙতে ভালা লাগেনি। আচ্ছা আন্‌বা।

খাইকি ফেরতে ফেরতে বিকাল হিয়ালা গণেশের। রাস্তারে ছুয়ামনে হা-ডু-ডু খেলেটে সউ দেখতে সে খাড়া হি গেলা কতক্ষণ। উখড়া কাপড়ের খুঁটর বাঁধিকি ঘরে আইসিকি তার-মাকে তিন-চারবার ডাকলা। সাড়া নাই পাইকি এমা-সেমা চাঁইলা গাড়িয়া ঘাটনু খুঁজি আইসিকি ঘরের পিছকে যাইতে দেখলা তার মা দুয়ার তলে কুঁকড়িকি শুইরইচে। গণেশ কোতকে ছুটি গেলা।

মা-মা কইকি ডাকলা কুন সাড়া-শব্দ নাই পাইকি হাঁটু আর বগলের তলে দুহাত ভরিকি উঠি আনলা কুনমতে। দুয়ারে শুইদিকি ছুটি গেলা ডাক্তারের কতকে। ডাক্তারের দুয়াকে আর যাইতে হিলানি। তার সাঙ্গে আড়িয়াপুরে দেখা হিয়ালা। সে কুমা যাইথাইলা ঘর ফেরেটে। ডাক্তারকে দেখিকি গণেশ ছুটি যাইকি তার গোড় দুটা ধরিকি কাঁদি পেকিলা—ডাক্তারবাবু আমার দুয়াকে বেলে চল। আমার মা কিরকম হি-ই-চে। কথা কয়নি। তুমার আমি সব পইসা শোধ করি দিবা তুমি বেলে চল।

ডাক্তার আর কিছু কইপারলানি তাকে দেখিকি। তার সাঙ্গে সাঙ্গে তার দুয়াকে গেলা। গণেশের মাকে পরীক্ষা করিকি ডাক্তার কইলা—গণেশ, তোর মা ত কিছুক্ষণ আগে মরিচে। অখন বি গা-হাত তমুন শক্ত হয়নি। গণেশ ডাক্তারের মুকে ফ্যাল ফ্যাল্ কি চাঁইকি ডুকরিকি কাঁদি পেকিলা—আমার মা নাই, মরিচে।

ডাক্তার কইলা—সকলকার মা একদিন মরি যায়, কাঁদনে কি হবে। অখন কাকে ডাক্‌বুত ডাক্। আমার আবার ঘর যাইকি এই সাঁজিয়াবেলা গা ধুইতে হবে।

ডাক্তার চালি গেলা। সন্ধ্যা হিয়ালা। চারুপাশ আঁধারে ভরি গেলা। গণেশ সেই যে তার মার পাশে বুসি রইচে আর উঠলানি। অখন সে কুমা যাবে কাকে ডাকবে ঠিক করি পারলানি মাকে একলা রখি দিকি। ধোবার মড়া ধোবা ছাড়া আর কো ছুঁবেনি। পাশাপাশি আর কুন ধোবার ঘরবি নাই। সকালের অপেক্ষা করিকি গণেশ বুসি রইলা ঠায় এক যাইগারে আশ্রয়-হীন হিকি তার শেষ আশ্রয় আঁকড়ি ধরিকি। আলোবি জ্বাললানি, ঘরকেবি গেলানি। বার বার কাঁদি কাঁদি কইলা মাগো, তুমি আমাকে একলা রাখিকি চালি গেল। এ ঘরত খালি হি গেলা। আমায় ত আর কো রইলানি। আমি আর কার সাঙ্গে কথা কইবা, কাকে 'মা' বলিকি ডাকবা গো মা অ্যা। অন্ধকার নির্জন যাইগারে তার সে চোখের জল, দুঃখ কথা কো দেখলানি—কো শুনলানি। কটা বাদুড় পাখা ঝাপ্‌টিকি অন্য মুহা উড়ি গেলা।

গল্পটি সংক্ষেপে এই রকম—

গাঁয়ের থেকে কাপড়ের পোটলা নিয়ে এসে গণেশ দেখে তার মা বিছানায় শুয়ে আছে। পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে পায়ে।

গ্রামের একধারে ছোট্ট একটি ঘর। সেই ঘরে সে আর তার মা থাকে। মা-ই তার একমাত্র সহায় সম্বল। সে যখন ছোট, তার বাবা এবং অন্যান্য ভাই-বোনেরা সমুদ্রের বন্যায় ভেসে যায় একদিন। তার মা এবং সে বেঁচে যায় কোন ক্রমে।

তার মা লোকের কাপড় সেদ্ধ করে। দু'জনে মিলে কাপড় কাচে। ওরা জাতে ধোবা।

পরের দিন গ্রামের এক হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ এনে মাকে দিল গণেশ। গ্রামে আর কোন ডাক্তার নেই।

দুপুরে খেতে বসে গণেশ তার মাকে বললো—উত্তর পাড়ার গ্রাম প্রধানের বাড়ীর বুড়ো মারা গেছে। তার মা শুনে খুব দুঃখ করলো।

শ্রাদ্ধ বাড়ী থেকে মুড়কি নিয়ে বাড়ী ফিরে গণেশ দেখে তার মা উঠোনে পড়ে আছে। টেনে টেনে তাকে বারান্দায় তুলে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারের জন্যে দৌড়লো গণেশ। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন তার মা মারা গেছে।

গণেশ এমনি বিস্মিত হলো যে সে কী করবে কিছুই ভেবে পেলোনা সেই মুহূর্তে। মৃত মায়ের পাশে বসে হা হুতাশ করে কাঁদতে লাগলো।

[মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের লোকভাষা এই রকম। এই ভাষায় এখানকার গ্রামবাসীরা ঘরের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। ওড়িয়া, হিন্দি এবং বাংলার অপভ্রংশ সংমিশ্রণে এই ভাষার উৎপত্তি। ভাষাটি একমাত্র গ্রামের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সাহিত্য সংসারে এর অনুপ্রবেশ ইতিপূর্বে ঘটেনি। লেখিকা শ্রীমতী ভট্টাচার্য এই ভাষায় প্রথম গল্প লিখে সাহিত্যের আঙ্গিনায় তুলে ধরলেন— [সঃ সাঃ সৈঃ]

(৩৬) রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ। দ্রষ্টব্য : হুগলীর বাহিরগড়া ও পারুল গ্রামের মন্দির।

(৩৭) রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি ও অন্যান্য মুনি-ঋষিদের উপস্থিতি। দ্রষ্টব্য : বীরভূমের সুরুলের মন্দির।

(৩৮) বাল্মীকির আশ্রমে লব কুশ কর্তৃক ধৃত হনুমানের আনয়ন। দ্রষ্টব্য : হুগলীর পারুল ও বাহিরগড়া গ্রামের মন্দির।

(৩৯) উপবিষ্ট রাম রাজা ও সীতা। দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, বীরভূমের সুরলের লক্ষ্মীজনার্দন এবং বর্ধমানের কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দির।

(৪০) সিংহাসনে উপবিষ্ট রাম ও সীতা ; পাশে লক্ষ্মণ ব্যজন হস্তে ও ভরত চামর হস্তে দণ্ডায়মান। পাশে দণ্ডায়মান বশিষ্ঠ মুনি এবং পদতলে হনুমান ও জাম্বুমান। দ্রষ্টব্য : বাঁকুড়ার কাদাশোলের মন্দির।

পশ্চিমবাংলার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মোটামুটি এই হল রামায়ণ কাহিনীর চিত্রায়ণ। আলোচ্য মন্দিরগুলির দেওয়ালে রামায়ণ কাহিনীর ঐসব বিষয়গুলি ছাড়াও অনুরূপ আরও অনেক মন্দিরে এই ধরণের ফলক দেখা যায়। বলা বাহুল্য, কথিত এই চিত্ররূপগুলির কোনটিই চূড়ান্ত নয়। এখনও গ্রাম-গ্রামান্তরে অবহেলা ও অনাদরে যেসব মন্দির কোন রকমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তার দেওয়ালেও হয়ত রামায়ণ কাহিনীর অনালোচিত কোন ভাস্কর্যফলক দেখা যেতে পারে এবং উৎকীর্ণ চিত্ররূপের এইসব পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলেই বঙ্গসংস্কৃতির এই অসম্পূর্ণ অধ্যায়টি যে সম্পূর্ণতা লাভ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নতুন বই

বনশিউলি : প্রভাস রায়। দেবশ্রী বুক ডিপো শান্তিপুর,নদীয়া। মূল্য ৫·০০ টাকা।

২৪ খানা ভিন্ন স্বাদের কবিতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে প্রভাস রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ— 'বনশিউলি'।

দু'-একটি কবিতা বাদে বাকী সবগুলোই লেখা হয়েছে অনেক আগে জীবনের বিভিন্ন সময়ে। "বনশিউলি" বইয়ের কয়েকটি কবিতায় বিভিন্ন মনীষীকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। কয়েকটিতে গ্রামের কৃষক শ্রমিকের দুঃখ বেদনার কথা বলা হয়েছে আবার কয়েকটিতে পল্লী প্রকৃতির ছবি ফুটে ওঠেছে। "জন্মভূমি-মা" কবিতায় কবি তাঁর জন্মভূমি শান্তিপুরের পূর্ণচিত্র এঁকেছেন।

'বনশিউলি'র কবি প্রভাস রায় জীবন সায়াহ্ন বেলায় দাঁড়িয়ে নিজ প্রিয়তমাকে বইখানি উৎসর্গ করে তাঁর উদ্দেশে বলেছেন —"গন্ধবিহীন বনশিউলির গুচ্ছ তোমার উদ্দেশ্যে অর্পণ করে আমি একটু তৃপ্ত হতে চাই।"

কবির সার্থকতা সেখানেই। মন তৃপ্ত হওয়া মানেই তো পরম প্রাপ্তি ঘটা। —মাধব ভট্টাচার্য

কুঁড়ি : রবীন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশিকা. মায়া রায়। রায়পাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মূল্য—৫·২০ টাকা।

প্রচ্ছদে আধফোটা ছোট্ট একটি পদ্ম। বইয়ের নাম –কুঁড়ি। লেখক রবীন্দ্রনাথ রায়।

কুঁড়ির প্রকাশ অতি সাম্প্রতিক কালে হলেও এই বইয়ের কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪৩।৪৪ বছর আগে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে। লেখক তখন সদ্য যুবক। অবাধ্য যৌবনের আবেগ উচ্ছ্বাস, অপরিণত চেতনার ছাপ কিছু কিছু কবিতার মধ্যে পড়েনি যে তা' নয়। মানুষের মানসিকতার ওপর সময় যে দ্রুতগতিতে ক্রম পরিবর্তনের রেখা টেনে চলেছে তাতে ৪৪ বছর পেরিয়ে আসা তরুণ সাম্প্রতিক কালের তরুণের

মনে কতটুকু ছাপ ফে াতে পারবেন ত তেও হয়তো সংশয় জাগতে পারে কারো কারো মনে। তবু বর্তমান বইতে এমন কিছু ছন্দের কবিত আছে যা' অনুভবের অন্তরে গেঁথে থাকে—একটা সুখস্পর্শ মনকে জুড়িয়ে রাখে কিছু সময়ের জন্যে। —মাধব ভট্টাচার্য।

প্রাপ্তি স্বীকার/শারদ সংকলন ১৩৮৮

নদীয়ার শক্তিনগর থেকে প্রকাশিত "কাবেরী সাহিত্য" শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত "স শপ্তক" ফুলিয়া এবং চাকদহ থেকে প্রকাশিত যথাক্রমে "টানাপোড়েন" ও "লবুহন্দা"। সালকিযা, হাওড়া থেকে "আনন্দহাট", "কৌশিকী"। মানবাজার পুরুলিয়া থেকে "জঙ্গলমহল"। মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে "অমৃতরেখা", "মেঠোপথ"। জুনপুট থেকে "কবিতার কাগজ"। বিলাসপুর মধ্যপ্রদেশ থেকে "বঙ্গভারতী"। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত "লোকশক্তি"। বরিশাল বাংলাদেশ থেকে "রূপসী বাংলা"।

OUR FUNCTION IS TO SOLVE ANY PROBLEM ON

ENTRY TAX

Such as :

* Making payment of entry tax at Mogra, Banitabla, Howrah, Shalimar & Parasat checkposts.
* Filing applications for refund, revisions and prefering appeals.
* Conducting cases.
* Releasing trucks at Chichira Sales Tax checkpost.
* Consultation on any problem of entry tax.

please contact :

TRANSPORT SERVICES

225, Mahatma Gandhi Road, 3rd Floor.

Calcutta—700 007.

Phone Numbers.

Calcutta	Mogra	Banitabla
H.O.	Hossenabad	Uluberia
33-0862	Tribeni 226	613-298

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন।
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন।

না, সেই ভদ্রমহিলা নয়। এবারের এক্সপোতে পছন্দ মত শাড়ীটি হাত ছাড়া হয়ে যেতে যিনি কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি নন। তবে তারই মত একজন এসেছিলেন আমাদের সমিতির ষ্টলে দিন কয় আগে।—'পাড়ার দোকানে আগের দিনের পছন্দ করা "টাঙ্গাইল" শাড়ীটি পরের দিন গিয়ে না পেয়ে তো অভিমানে মেয়ে শাড়ীই কিনলো না।—সেই সিল্কের শাড়ীটিই তার চাই। তাই আপনাদের ঠিকানা সংগ্রহ করে মেয়েকে নিয়ে আপনাদের এখানেই চলে এলাম সেই শাড়ীর খোঁজে—।'বললেন ভদ্রমহিলার মা।

আমরা তাকে তার পছন্দ মত শাড়ীটিই দিতে পেরেছিলাম। —অভিমান মুছে গিয়ে হাসি ফুটলো তার মুখে। মা হাসতে হাসতে বললেন,—'বান্ধবীর বিয়েতে সাজবে বলে এত কাণ্ড।

আপনারাও আসতে পারেন। খুব একটা দূর নয়। শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুর লোকালে ফুলিয়া ষ্টেশন। দু'ঘন্টার পথ। ষ্টেশন থেকে পায়ে হাঁটলে দশ মিনিট। বৈঁচা বসাকপাড়ায় ৺সুরেশ ঘোষের বাড়ী। আমাদের সমিতির দু'টো ষ্টল। অফুরন্ত ষ্টক। এখানেই টাঙ্গাইল শাড়ী বোনাও হচ্ছে। আমরা আপনার বিয়ের কনেকেও সাজিয়ে দিতে পারবো টাঙ্গাইল শাড়ীর বিচিত্র বাহারে।

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমিতি লিঃ
টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

বৈঁচা বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া।

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য * প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া।
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

[কবিতায় মোড়া সংখ্যা]

[প্রকৃতি প্রেমী এক অখ্যাত আত্মপ্রচার বিমুখ লেখিকার এক গুচ্ছ কবিতায় "সাহিত্য সৈকত" এর বর্তমান সংখ্যা পূর্ণ হলো। শহর থেকে দূরে নির্জন বনানীর ছায়াতলে প্রকৃতির কোলে লেখিকার বাস। অনেকটা আমাদেরই চেষ্টা এবং ইচ্ছায় কবিতাগুলো প্রকাশিত হলো। লেখিকা নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। পাঠকের অনুভূতির অন্তরে তাঁর কবিতা যদি স্থান করে নিতে পারে তো সেটাই তাঁর বড় প্রাপ্তি।]

নতুন লেখকদের প্রতি ঃ

১) *সাহিত্য সৈকত* পত্রিকায় লিখতে ইচ্ছুক হলে আপনার নির্বাচিত একটি মাত্র কবিতা বা গল্প বা প্রবন্ধ পাঠিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। আপনার ভাল লাগা একগুচ্ছ কবিতা পাঠান বা গোটা কয় গল্প বা প্রবন্ধ (যে যা লেখেন) পাঠান। আমরা বেছে নেবো। প্রয়োজন বোধে একগুচ্ছ লেখাই ছাপতে পারি।

২) প্রতি রবিবার লেখকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তর খোলা থাকে। লেখার বিষয় নিয়ে আগের থেকে আলোচনা করে নিয়ে লিখলে ভাল হয়। দূরের লেখকেরা পত্রালাপের মাধ্যমে কাজ সারতে পারেন।

৩) লেখকদের আমরা পারিশ্রমিক দিতে পারিনা। তবে বৎসরান্তে ভাল রচনার জন্য একজনকে পুরস্কৃত করে থাকি।

With best compliments from :

LEATHERS INDIA

59, Phears Lane,
CALCUTTA

দুরাশা

প্রভাতে অরুণ উষা
নববেশে মধুরাগে
ঝরায় আলোর ধারা
পৃথিবী সুন্দর—
বাসি স্মৃতি গেছে মুছে
কলুষ মালিন্য যত
নিঃশেষ বিলীন
সকালের সোনা রোদ
সুগন্ধি আতরে যেন
মনকে রাঙায়।

বেলা যায় চলে
ধীর মন্থর পায়ে
কোমল নির্যাস তার
কে যেন দিয়েছে ধুয়ে
অগোচরে মন তাই
অস্থির চঞ্চল
প্রাণ কাঁদে হতাশায়
না পাওয়ার বেদনায়
বিষাদ বিধুর।

রাত্ত নামে
গভীর রাত্রি দু' চোখ ভ'রে
যন্ত্রণা কাতর স্মৃতি
হৃদয়ে গভীর ক্ষত
অপূর্ণ কত না আশা
বৃশ্চিক দংশন।
নিরুপায় মন তাই
আত্মদান অবশেষ
গভীর নিদ্রায়
আগামী প্রভাত হবে
সুন্দর উজ্জ্বল এই দুরাশায়।

সবুজ ক্ষেতের ধারে

বহুদিন পরে সবুজ ক্ষেতের ধারে
এসেছি হেঁটে হেঁটে
নিরালা পথ ধরে।
সোনালী গম শিস্
বাতাসে নুয়ে নুয়ে
আমারে জানায় প্রীতি
শিশির ভেজা ভোরে
ঘাসের গালিচা পাতা
যেদিকে দু' চোখ যায়
আঃ, বুকভরা মেঠো ঘ্রাণ
আমাকে মাতাল করে।

অতীত স্মৃতি

সোনা রোদের একটু ঝিলিক
বুকের মধ্যে সুখের আভাস।
ছলকে ওঠে অতীত স্মৃতি
আখের ক্ষেতে স্বচ্ছ বাতাস।
পথ ভুলেছে আপন মনে
জংলী ফুলের মৌ মৌ শ্বাস,
দীর্ঘশ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে
কাঁপন জাগায় নদীর জলে।
গাছের ছায়া থির থিরিয়ে
গেড়ি, ঝিনুক, শুগলি তোলে,
সুখের স্মৃতি দুখের স্মৃতি
অতল তলে যায় হারিয়ে।
চর খুঁজছে ডুব সাঁতারে
মুঠি ভরা জল পিছ্‌লে পালায়,
পায়নিকো তাই কিছুই এখন
পেছন ফিরেই পথ হারিয়ে
সামনে বাধা যখন তখন
চড়াই খাড়া বিশাল পাহাড়।

ধূসর আকাশটা

ধূসর ভ্রুকুটিময় আকাশটা এখন
ভয় দেখাচ্ছে কিনা কে জানে
ভীষণ ভালো লাগছে তবু ওকে।
ওই গুরু গুরু রব যেন উঠে আসছে
আমার নাভিমূল হতে
আমি পরিচিত ওর সাথে
বহু জন্মের পূর্ব থেকে
ঝিলমিল চমক হেসে গেলো
ওই বিদ্যুৎ বাণী
যেন ইসারায় কথা করে কানাকানি
প্রতিটি হৃদয়ে হৃদয়ে
বৃষ্টি এলো ঝম্‌ঝমিয়ে
যেন কান্না স্রোতে সব ম্লান
ধুয়ে মুছে দিল।

ওগো পুবালী মেঘ

ওগো পুবালী মেঘ
ভেসে ভেসে তুমি যাও কোন দেশে
কতদূর যাবে, কোথায় থামবে
আমারে বলে যাও।
বহু দূরে মোর রয়েছে যে প্রিয়
তারে গিয়ে তুমি একথা বলিও
আমার বিরহী অশ্রু ঝরেছে নীরবে
হৃদয় আমার কেঁদেছে গোপনে
তারে পাবো আমি কেমনে সে কবে
তারে তুমি শুধায়ো।
নয়তো আমায় লওগো সাথে
দেখবে না কেউ এ বাদল রাতে
তোমার জলের ঝালর আড়াল করে
আমায় পৌঁছে দিও বধুর ঘরে।

উদাসী বিকেল

উদাসী বিকেল এলো
ঝিরি ঝিরি মেঘ হয়ে
আমি তো চাইনি তাকে
আমার হৃদয়ে
কেননা আমি তো নির্জ্জনবাসী
কোলাহল হতে দূরে
বিকেলটা একান্ত আমার বলে
সোনা রোদ সুরে সুরে
আমার নিঃসঙ্গ মনে
শব্দ ছড়াবে চারিদিক
মেঘ যেন দীর্ঘশ্বাস
বয়ে বয়ে নিয়ে আসে
হিমেল হাওয়ায়
দোলে কত ব্যথাপ্রাণ
বৃষ্টির আড়ালে
অনাকাঙ্খিত বিলাস বিকেলে।

বিষণ্ণ ধূসর সন্ধ্যা

বিষণ্ণ ধূসর সন্ধ্যা
হেমন্তের রাঙা গেরুয়া ধূলায় নামছে ধীরে
কাঠ গোলাপের পাতা ছুঁয়ে যায় ওড়না তার
শেষ হেমন্তের সোনালী ধানে চুম্বন হানে
সোহাগে আদরে আঁচলে ঢাকে বক্ষ তার।
দিন শেষের উষ্ণতা নিয়ে
উড়ে যায় পাখী
আপন নীড়ের পানে
পাখায় পাখায়
আঁধার আঁচল পিছু পিছু ছুটে জড়াতে চায়।
ঘনায় নিস্তব্দ রাত
ধূসর পাখনা মেলে
পৃথিবীর বুকে
বিষণ্ণ আঁধার কখন
ঢেকেছে আকাশ কোলাহল শেষে।

রূপেই মাখামাখি

রূপোর জলে স্নান সেরে
লুকোচুরি খেলা খেলে
আকাশে ঐ পূর্ণিমার ঝলমলে চাঁদটা
সারারাত ধরে সাঁতার কেটে পার হয়ে যাবে বুঝি
অনন্ত অসীম মালিন্যময় পথ
স্থির বিশ্বাস জেনে
যাত্রা তার সুরু
রূপোর জ্যোতি রূপেই মাখামাখি।

দীর্ঘরাতের অন্ধকারে

শরৎ রাতের শিউলি ঝরা মৃদুল বাতাস
দীর্ঘ রাতের অন্ধকারে শিশির ভেজা দীর্ঘনিশ্বাস
আঁধার আলোয় জ্যোৎস্নারাতে
গোপন কান্না গুমরে ওঠে
পাতার ফাঁকে শির শিরিয়ে
একটি বকুল পড়লো লুটে।
ফুল কলিরা চমকে ওঠে ভোরের বেলা জাগতে হবে
সারা রাতের শিশির ফোঁটা
যখন আদর করে পড়বে ঝরে।
প্রথম ভোরের সোনার আলো
চুম কুড়িতে রাঙিয়ে যবে
ঘুম ভাঙ্গাতে সুরে সুরে
আদর করে সোহাগ ভ'রে
সোনা রোদের আলো যখন
হারিয়ে যাবে ম্লান আকাশে
শেষ বিকেলে নীল আকাশে
শুকতারাটি নাচবে এসে
মধু লুটে পরাগ মেখে প্রজাপতি ফিরবে ঘরে
তখন শিশির কণায় অশ্রু মেখে
ভোরের কলি পড়বে ঝরে।

নাম না জানা গাছ

দূরে ওই পত্রশূন্য নাম না জানা গাছ
একপায়ে দাঁড়িয়ে কতকাল
সকালের প্রথম রোদ মাথায় ওঠে
দোল খায় আপন মনে।
শেষ রোদ বিকেলের
সোনা মাখায় গায়ে
পাখি কত আসে
বসে বসে চলে যায়।
নিঃসঙ্গ নীরব গাছ দাঁড়িয়ে তবু
কতকাল একা একা নিঃশব্দে
পত্র পুষ্প ঝরে গেছে কবে
নির্জন নির্বাসন
আমৃত্যু হেথায়।

সবুজের লালিমা

বনান্তরে সবুজের লালিমা ঢালা
কৃতির অকৃপণ তৃপ্তিময় হাসি
ম্প পর্ণে কত রং আলিম্পন্
ধরী সেজেছে শ্যাম উজলা।
ন নিবিড় বনচ্ছায়
াতী লতার অঞ্চল লুটায়
ায় কোরকে কোরকে কানাকানি
রিত পুবালী বায়।
সন্ন বর্ষায় কাঁপে থর থর
ছ গুচ্ছ মালঞ্চের সীতাহার
টাপ সোনালী হাসি ঝরে
ণার মত অবিরল ঝরঝর।
কৃতি এক খেয়ালী কবি
ঙ্গ রঙ্গে কত খেলা চলে
তি নিতি লাবনিতে সাজে
মি শুধু আঁকি তারি ছবি।

মিথ্যে মোহ

নিত্য আমি হারিয়ে খুঁজি।
আমার গোপন হৃদয়টাকে
সে যে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়
অলিগলির ফাঁকে ফাঁকে।
সবুজ পাতা আড়াল করে
ঘুরে বেড়ায় ডালে ডালে
খুঁজি আমি আকুল হয়ে
পদ্মফোটা গভীর ঝিলে।
পাখীর পাখায় উধাও কখন
অলস দৃষ্টি এই উন্মন
পাইনে নাগাল সারাবেলা
পেছন ছুটি যখন তখন।
রঙ্গিন ফুলের পাপড়ি নিয়ে
মাতন লাগে রঙ্গিন খেলায়
আমার রং তুলি সব রইল পড়ে
আমি ঘুরি তারি নেশায়।
সকল বেলা গেল কেটে
এই চঞ্চল চিত্ত নিয়ে
নিত্য রচি অলস বৃত্ত
মিথ্যে মোহে খেটে খেটে।

"সাহিত্য সৈকত" এর পরবর্তী সংখ্যাটি

ফুলিয়া বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা হিসাবে অক্টোবর ১৯৮২ এর শেষাশেষি প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যায় বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ ফুলিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে লিখবেন।

* ফুলিয়া কেমন করে হলো!
* ফুলিয়া টাউনশিপের জন্ম থেকে অদ্যাবধি তথ্যবহুল প্রামাণ্য ইতিহাস।
* রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।
* ফুলিয়ার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার ইতিহাস।
* টাঙ্গাইল শাড়ীর ইতিহাস।

ফুলিয়ার উন্নয়ন মূলক চিন্তা ভাবনা এবং উন্নতির অবকাশ— এই সম্পর্কে কয়েকটি সাক্ষাৎকার।

ফুলিয়াবাসীদের উদ্দেশ্যে ঃ—

* ফুলিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে ফুলিয়ার প্রতিটি নাগরিকের সুস্থ এবং মূল্যবান চিন্তাকে আমরা স্বাগত জানাই। আপনিও আপনার চিন্তা ভাবনা আমাদের লিখে জানাতে পারেন।

Registered with the Registrar of News Paper for India
Decl. No. 41/13/AL/81 P. Regd. No-WB/NDA/(S)-64

পূজোর যদিও বেশ ক'দিন বাকী এখনও আমাদের কিন্তু সমস্ত প্রস্তুতি সব রকমের আয়োজনই শেষ। অপেক্ষা শুধু অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে। তাঁরা এলেই অনুষ্ঠান যজ্ঞ পুরোপুরি সম্পূর্ণ হবে। অনেক দূরের কেউ-কেউ ইতিমধ্যেই এসে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের আত্মীয়তা। আমাদের তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। তাই আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেননি।

আপনাদের সকলকে আমাদের মণ্ডপে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাইকে আলাদা ভাবে নিমন্ত্রণ জানাতে না পারার ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

ভিড় এড়াতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ীর সকলকে নিয়ে চলে আসুন। পথ নির্দেশটা দিয়ে রাখি। শিয়ালদা থেকে আসেন তো শান্তিপুর লোকাল ট্রেনে চেপে সোজা ফুলিয়াতে নামুন। এসপ্লানেড থেকে এলে একটানা বাসেও চলে আসতে পারেন। ফুলিয়া স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে আট মিনিটের পথ আমাদের মণ্ডপ।

যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলে দেবে। চলে আসুন শীগ্‌গির। টাঙ্গাইল শাড়ীর ভ্যারাইটি পেতে হলে আমাদের সমিতিতে আসুন।

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমিতি লিঃ

টাঙ্গাইল তন্তুজীবী সমবায় সমিতি উন্নয়ন লিঃ

বৈঁচা বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া।

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য * প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া।
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগনা।